উৎসর্গ

সমস্ত দাঙ্গাপীড়িতদের

"May our earth all its beauty produce a harvest of Peace and Prosperity."

— Rigveda

● ভূমিকা ●

'হিন্দু না ওরা মুসলীম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন' - অথচ এই হিন্দু মুসলীম নিয়েই দাঙ্গা ঘটে গেল ভারতবর্ষের বুকে বেশ কয়েকবার। কিন্তু কেন-কিসের এই দাঙ্গা ! কোন হিসাব কাজ করে যাচ্ছে বার বার এই দাঙ্গার পিছনে ? কোন মৌল বাদী শক্তি বার বার এই দাঙ্গার ইন্ধন জুগিয়ে আসছে। এর পিছনে কি সত্যিই কোন হিন্দু অথবা মুসলীম অথবা অন্য কোন 'ধর্ম' কাজ করে যাচ্ছে ?

এই ধর্ম নামক আগুন নিয়ে মিছিমিছি খেলা করে কি লাভ হয়েছে বা হচ্ছে ? ধর্ম তো সর্বকালের সর্বসময়ের জন্য পবিত্র বা 'ওঁ' কার ধ্বনি। যার সুফল সবসময় সকল মানুষের প্রতি বর্তায়। সে ধর্ম হিন্দু হতে পারে, সে ধর্ম মুসলীম হতে পারে, সে ধর্ম জৈন বা খ্রীষ্টান হতে পারে। সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষ তার নিজের ধর্মকে যদি ঠিক ঠিকমত ভালোবাসতে পারে তবে প্রত্যেকেই অপরের ধর্মকে নিশ্চয়ই ভালোবাসতে পারে। এটা শাশ্বত শক্তি। এর বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি বা তাৎক্ষণিক প্রয়োগ বিদ্যাও যথেষ্ট বিদ্যমান। এই অর্থে বলা যেতে পারে নিজের সন্তানকে ভালোবাসলে নিশ্চয়ই অপরের সন্তানকে ভালোবাসা যায়।

ভালোবাসার প্রকৃত অর্থই হল রক্ষণাবেক্ষণ। এই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তারা যদি সুকর্তা না হোন অথবা নিজেদের প্রতি আজ্ঞাবহ না হোন তবে যে রক্তপাতই ঘটুক না কেন সেটা হবে হিংসাশ্রয়ী রক্তপাত। শুধু আগুন জ্বাললেই হবে না সেই আগুনে আবর্জনা পুড়ছে না মানুষ পুড়ছে না রাষ্ট্র পুড়ছে না ধর্ম পুড়ছে সেগুলোর বিচার নিশ্চয়ই করতে হবে।

এত কথার পিছনে একটিই কথা সেটি হল ৬ই ডিসেম্বরের রবিবারের কথা। কলঙ্কিত, অভিশপ্ত যাই বলা হোক না কেন পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের নামের পাশে 'ধর্মনিরপেক্ষ' এই কথাটা আর লেখা যায় না। আমরা জানি একথাটা বললে মোটেই আমাকে হিন্দু সমাজ কাফের বলতে পারবে না। হাজার হাজার বছর ধরে আমিও দাবী করে আসতে পারি আমি প্রকৃতই হিন্দু। আমার দেশ ভারতবর্ষ। আমি আমার পবিত্র ধর্মস্থান মন্দিরে যাই, আমি আমার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ

বেদ, গীতা, রামায়ণ পাঠ করি। এর মধ্যে একটিও অসত্য নেই। আমাতে তোমাতে শুধু একমাত্রই ভেদাভেদ 'তুমি মসজিদে যাবে, আমি মন্দিরে যাব' — তোমার উপাসনা তুমি করবে আমার উপাসনা আমি করব। আমরা একই অফিসে যখন চাকরী করি তখন আমাদের প্রত্যেকের একই কর্ম নয় - একই পদাধিকারীও নই - সেখানে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম কত সুন্দরভাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিই। তখন শুধুমাত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য - রুটি রোজগারের ধান্দায় সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তায় দিন গুজরান করি, আমাদের প্রত্যেকটি দাবী দাওয়া নিয়ে আমরা নির্ভিকভাবে সকলে মিলে সোচ্চার হই, অফিস ফেরতা যাত্রী আমি আমার উপাস্যদেবতা মন্দিরে নমস্কার করি, আমার সহকর্মী নমাজ পড়তে চলে যায় মসজিদে, মানুষের কোন ভেদাভেদ নেই, ধর্মের অনুশাসন নেই, নিষ্ঠুরতা নেই। অথচ বাহ্যিক আড়ম্বর, কতগুলো হিংসাশ্রয়ী ব্যক্তির দাম্ভিকতা আমাদের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ রক্তের হোলিখেলায় মাতিয়ে তোলে।

৬ই ডিসেম্বরেও সেই কালরাত্রি ভূমিকম্পের মত আমাদের নাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেই হিংস্র ড্রাগনের লেলিহান শিখা গ্রাস করবার মুখেই আমরা সাবধানতা অবলম্বন করি। ফলত বিষ বেশী দূর ছড়াতে পারেনি। তবুও সেই ড্রাগনের লেলিহান শিখা ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ স্পর্শ করার মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে এই 'অযোধ্যা কাণ্ড' সম্পাদনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধরণের মানসিকতা-অভিজ্ঞতার ফসল বিভিন্ন লেখকের কলমে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠককুল যদি এই বই পড়ে দাঙ্গার সেই বিষময় ফলগাছ বাড়ার আগের মুহূর্তেই ধ্বংস করতে পারেন তবেই সার্থক হবে আমার এই মালা গাঁথা।

পরিশেষে যাঁরা লেখা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, পরিশ্রম করে পরিপূর্ণ মালা গাঁথার সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

এঁরা লিখেছেন

অমিতাভ চৌধুরী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, জিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, মানস ভাণ্ডারী, অর্ক চৌধুরী, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথি রুদ্র, আশিস সান্যাল, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু ভৌমিক।

এক

যোদ্ধা বনাম অ-যোদ্ধা,—
কাণ্ড এখন অযোধ্যা।।
আসছে যত করসেবক,
ধর্ জোরসে, ধর্ 'সেবক।'
জেলের ভেতর টেনে তোল,
থেমেই যাবে গণ্ডগোল।

দুই

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো,
কার্ফু এলো দেশে,
দাঙ্গাবাজে ধান খেয়েছে
মুখ লুকোবো কিসে?

তিন

কেউ বলে থাকো থাকো,
কেউ বলে — 'যাও',
ইড়ুলি রসম্ ছেড়ে
কাঁচকলা খাও।
কেউ বলে — 'রিলিফের
টাকা আগে দাও',
সব কথা শুনেটুনে
অবিচল রাও।

চার

কোথায় সীতার রান্নাশালা,
কোথায় রামের আঁতুড় ঘর
মসজিদে সব চাপা আছে
ভেঙে চুরে বাহির কর।

পাঁচ

মুখে কালি দিয়েছে ওই
ট্যাংরা এবং মেটেবুরুজ,
কালো মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে
উঠছে আবার লাল সুরুজ।

ছয়

কেউ খায় নিমপাতা,
কেউ খায় রাবড়ি,
কেউ যায় ভয়ে ভয়ে
কেউ যায় দাবড়ি,
কেউ কাটে নিজ মাথা,
কেউ নেয় সাবড়ি,
কেউ ভাঙে ইতিহাস
কেউ ভাঙে বাবরি।

অমিতাভ চৌধুরী

অযোধ্যা : বিশ্বাসের অপমৃত্যু

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কলঙ্কিত রবিবারের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় টেলিভিশনের ছোট পর্দায় পি ভি নরসিংহ রাও নামে এক ভদ্রলোক কী সব বলছিলেন। কিছুটা কানে যাচ্ছিল, কিছুটা যাচ্ছিল না। অযোধ্যায় তাণ্ডবের খবরে মনটা এতই ভারাক্রান্ত ছিল যে সবটা শোনার মতো অবস্থা ছিল না।

কিন্তু যিনি কথা বলছিলেন তিনি ভারত নামক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। কথাগুলোও বলছিলেন ভালো-ভালো। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ জাতির লজ্জা ....আরো কতো কী। সেই সঙ্গে বলেছিলেন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সংকল্পের কথা।

স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, শুনছি বটে, কিন্তু তাঁর কথায় মনে বিশ্বাস জাগছে না। কী করেই বা জাগবে ? যিনি আমাদের মনে বিশ্বাস জাগাতে চেষ্টা করছেন তিনি নিজেই যে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার !

এই বিশ্বাসঘাতকতা কথাটা হাওয়ায় খুবই ভাসছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জোট তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ঐ জোট কথা দিয়েছিল, তারা আদালতের নির্দেশ মানবে, তারা বিতর্কিত এলাকায় মন্দির নির্মাণের চেষ্টা করবে না, সবচেয়ে বড়ো কথা তারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস হতে দেবে না।

সেই সব প্রতিশ্রুতি আজ ধুলোয় লুটোচ্ছে। ঠিক যেমন ধুলোয় লুটোচ্ছে বাবরি মসজিদের জীর্ণ কাঠামো।

আরও একটা বিশ্বাসঘাতকতার কথা উঠেছে। সেই অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে পি ভি নরসিংহ রাওয়ের বিরুদ্ধে। তাঁর প্রতি দেশবাসী যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিল, সেই বিশ্বাস তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। বিশেষত দেশের মুসলমান সমাজ যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিল তা তিনি রক্ষা করতে পারেন নি।

অথচ ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফ্রি হ্যান্ড' তা তিনি যতোটা পেয়েছিলেন অতীতে ভারতের আর কোনো প্রধানমন্ত্রী তা পেয়েছে বলে মনে হয় না। জাতীয় সংহতি পরিষদ তাঁকে দিয়েছিল 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' — অযোধ্যা সঙ্কট সমাধানে যা ভালো বোঝেন তা করার স্বাধীনতা। জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত কখনও এমন স্বাধীনতা পান নি। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী পেয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা করার সময়।

কিন্তু জাতীয় সংহতি পরিষদের বৈঠকে সব দল মিলে (বি জে পি বাদে) যখন নরসিংহ রাওকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছিল তখন তারা একটা কথা ভুলে গিয়েছিল — তিনি ইন্দিরা গান্ধী নন, জওহরলাল নেহরু নন, এমন কি লালবাহাদুর শাস্ত্রীও নন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানি আক্রমণের মোকাবিলায় লালবাহাদুরের দৃঢ় ভূমিকার কথা আমরা কেউই ভুলিনি।

জওহরলালকে বলা হতো ভারতীয় রাজনীতির 'হ্যামলেট'। তিনি দোটানায় ভুগতেন শেক্সপীয়রের নাটকের নায়কের মতো। কিন্তু এবার দেখা গেল নরসিংহ রাও নামক ভদ্রলোকটিও এই অভিধা দাবি করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর আসনে অকস্মাৎ অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি যে পথ অনুসরণ করেন তার নাম দেওয়া হয় 'সমঝোতার

রাজনীতি'। কথায় বলে গরজ বড়ো বালাই। এই ধরণের পথ অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। লোকসভায় যাঁর গরিষ্ঠতা নেই তাঁকে তো কিছুটা আপসের পথে যেতেই হবে।

কিন্তু কোথাও তো একটা সীমারেখা টানতেই হবে। কতো দূর আপস ? কতো দূর সমঝোতা ? বিশেষ করে একটি বিশেষ গোষ্ঠী ছাড়া যখন বাকি সকলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তখনও কেন আপস আর সমঝোতার পথ আঁকড়ে রইলেন নরসিংহ রাও ? কাদের তিনি বিশ্বাস করছিলেন ? তারা কি বিশ্বাসের যোগ্য ?

আমরা জানি অযোধ্যার স্থানীয় প্রশাসন রাজ্য সরকারের হাতে। সুতরাং সেই বি জে পি সরকার কোনো আগাম খবর দেবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরে শুনে আসছি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গোয়েন্দা দপ্তর আছে। তারা কি কোনো আগাম খবরই জোগাড় করতে পারে নি যে অযোধ্যায় কী ঘটতে চলেছে ? একের পর এক রাজ্য থেকে হাজারে-হাজারে করসেবক অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে কী জন্য অযোধ্যা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তার কোনো আভাসই দিতে পারলেন না ?

এর থেকে অনেক প্রশ্ন ওঠে। ঐ গোয়েন্দা দপ্তর কি একেবারেই অপদার্থ ? নাকি সরষের মধ্যেই আছে ভূত ? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সর্বোচ্চ আসনে যিনি বসে আছেন সেই শঙ্কররাও চবনের কী কাজ ? শরদ পাওয়ারের সঙ্গে কোন্দল করা এবং মাঝে মাঝে উত্তর প্রদেশের বি জে পি সরকারকে হুমকি দেওয়া ? এই ভদ্রলোকই বা এখনও কেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরে রয়েছেন ? বাবরি মসজিদের চূর্ণ ইটের মধ্যে চিরদিনের মতো লেখা হয়ে রইল তাঁর তুলনাহীন ব্যর্থতার মসীলিপ্ত কাহিনী।

অযোধ্যায় উন্মত্ততার পর অনেক তুলনার কথাও হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। কেউ বলছেন ৭ ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখটি ৩০ জানুয়ারি

১৯৪৮ তারিখটির মতোই কলঙ্কিত—কারণ এ হলো দ্বিতীয়বার মহাত্মা গান্ধীর হত্যা।

বি বি সির বিখ্যাত সাংবাদিক মার্ক টালি সেদিন বললেন, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার ঘটনা ১৯৮৪ সালের জুন মাসের 'অপারেশন ব্লু স্টারের' সঙ্গে তুলনীয় কারণ ভারতীয় ফৌজ সেদিন আর একটি ধর্ম সংস্থান অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ধ্বংস করেছিল। টালি সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলতে হয়, এই তুলনা পুরোপুরি ঠিক নয়। অযোধ্যা ও অমৃতসর, দুই জায়গাতেই ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছে ধর্মস্থান। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ভারতীয় ফৌজ স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করেছিল সম্পূর্ণ পৃথক এক পটভূমিতে।

তুলনা যদি করতেই হয় তবে করা উচিত ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ তারিখের সঙ্গে, যেদিন শিখ রক্ষীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। সেদিনও দেশ এসে দাঁড়িয়েছিল সর্বনাশের কিনারায়। ৭ ডিসেম্বরের পর দেশ আবার আজ সেখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।

আর ঐ যে বিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি ? তার কী হবে ? তুলনা যদি করতেই হয় তবে চলুন ফিরে যাই তিরিশ বছর আগে, যখন চীনের ফৌজ আক্রমণ করেছিল ভারতকে। ভারতীয় ফৌজের আকস্মিক বিপর্যয়ের মুখে ভেঙে পড়ে জওহরলাল বলেছিলেন, চীনাদের আমি বিশ্বাস করেছিলাম, তারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেই বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত জওহরলাল তাঁর বাকি বছর দুয়েকের জীবনে আর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

নরসিংহ রাও বি জে পি-ভিএইচ পি— আর এস এসকে বিশ্বাস করেছিলেন। তারা কথা রাখেনি। দেশবাসী নরসিংহ রাওয়ের উপর বিশ্বাস রেখেছিল। তিনি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেননি।

বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে আপাতত শেষ হলো সেই কাহিনীর একটি পর্ব যার গোড়াতেই ছিল বিশ্বাসের কথা। রামমন্দির যারা নির্মাণ করতে চায় তারা শুরু থেকেই বলে আসছে, ঐ জায়গায় রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল কিনা তা বলার এক্তিয়ার আদালতের নেই, প্রশাসনের নেই, পুরাতত্ত্ব বিভাগের নেই, ইতিহাসবিদদের নেই।

এটা নাকি পুরোপুরি বিশ্বাসের ব্যাপার ! অথচ সেই বিশ্বাসই নিহত হয়ে পড়ে আছে সেই স্থানটিতে যেখানে গত প্রায় পাঁচশ' বছর ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বাবরি মসজিদ !

অযোধ্যার আগুন ছড়িয়ে পড়ছে

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে কয়েক শতাব্দী ধরে যখন অগ্নি সঞ্চিত হয় তখন তার বিপজ্জনক পরিণতির কথা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। বিপদ আসন্ন, একথা কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বললেও তা সব সময় খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয় না। কিন্তু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি যখন অগ্ন্যুদ্গার শুরু করে এবং বিধ্বংসী অগ্নিস্রোত চারিদিকের নগর জনপদ গ্রাস করতে থাকে তখন অসহায়ভাবে সেই অগ্নিগ্রাসের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই প্রায় করার থাকে না। একটানা কয়েক শতাব্দী ধরে রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ ঘিরে যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল তার তলার আগুনকে উপেক্ষণীয় ভেবে যারা এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁরা এবার তাঁদের ভুল বুঝতে পারছেন। কিন্তু খুব দেরিতে বোঝার জন্যে সমস্ত পরিস্থিতিটাই প্রায় তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। অযোধ্যার আগুন এখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। আগুনের হলকা প্রতিবেশী দেশগুলিকেও উত্তপ্ত করে তুলেছে।

কয়েক লক্ষ করসেবকদের প্রচণ্ড আক্রমণে রামমন্দির-বাবরি মসজিদ গত ৬ ডিসেম্বর ধূলিসাৎ হওয়ার সংবাদ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া মাত্র উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। গুজরাত, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, আসাম, পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় শহরে এখন বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের

মত হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে। মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদকারীদের মিছিলের আক্রমণে বহু নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলিতেও আইনভঙ্গকারীদের অনেকে হতাহত হয়েছে। এই প্রসঙ্গ লেখার সময় পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ লোকের মৃত্যু হয়েছে ভারতের বিভিন্ন শহর জনপদে। বোম্বাই শহরে পুলিশের গুলিতে নিহতর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তা অর্ধশত পেরিয়ে গেছে। কলকাতায়, আসানসোল-কুলটি অঞ্চলে মিছিলকারীদের আক্রমণে ও পুলিশ সৈন্যবাহিনীর গুলিতে অন্তত দশজনের প্রাণ গেছে। সারা শহরে কার্ফু জারি করে অবস্থা আয়ত্তে আনতে হয়েছে।

ভারতে যখন সর্বত্র এইসব নারকীয় ঘটনা ঘটে তখন পাকিস্তানে একতরফা আক্রমণে পনেরটা মন্দির, গুরুদ্বার বিধ্বস্ত হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে ছাব্বিশজন হিন্দুর। তার জন্য কোথাও পাকিস্তান সরকার হামলাকারিদের ওপর গুলি চালায়নি, পরন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ভারতে 'বাবরি মসজিদ' বিধ্বস্ত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। বাংলাদেশেও ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বিক্ষোভকারীদের মিছিল প্রচণ্ড হয়ে সংখ্যালঘুদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। তবে বাংলাদেশ সরকারের সময়োচিত দৃঢ়তায় বিক্ষোভ খুব বেশি বিধ্বংসী হতে পারে নি। পাকিস্তানে পনেরটি মন্দির ও গুরুদ্বার বিধ্বস্ত হলেও সেখানে সংখ্যালঘুদের কোন প্রতিবাদ মিছিল কোন শহরে বার হওয়ার সংবাদ কোন সূত্রে পাওয়া যায় নি। শুধু এক তরফা আক্রমণে ২৬ জন সংখ্যালঘুর মৃত্যু হয়েছে। অথচ একটি বিতর্কিত জীর্ণ সৌধ বিধ্বস্ত হওয়ার প্রতিবাদ জানাতে সারা ভারতে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বললো তাতে এই সত্যই প্রমাণ হয় যে ভারতে সংখ্যালঘুদের যে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি আছে তা ভারত উপমহাদেশের আর কোথাও নেই। কংগ্রেস, জনতা দল, কমিউনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি

রাজনৈতিক দলগুলির সমবেত দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আবার অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে মসজিদ গড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মসজিদ ভাঙার জন্য প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে লোকসভার বিরোধী দলের নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, বি জে পি প্রেসিডেন্ট মুরলীমনোহর যোশী সহ বহু বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিং মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা বলে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভেঙে দিয়ে সে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বি জে পি নেতা আদবানি বলেন, কাশ্মীরে সম্প্রতিককালে উনিশটি মন্দির বিধ্বস্ত করা হয়েছে কিন্তু তার প্রতিবাদ বিজেপি ছাড়া অন্য কোন দলকে করতে দেখা যায় নি। আর অযোধ্যার রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কয়েকটি রাজ্য সরকার সারা ভারত জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। যে চার শতাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হল সাম্প্রতিক দাঙ্গা হাঙ্গামায়, তার নৈতিক দায়িত্ব তিনি নিতে রাজি আছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে আদবানি বলেন, এইসব অবাঞ্ছিত প্রাণহানির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বল নীতিই সম্পূর্ণ দায়ী, সুতরাং তাঁর নৈতিক দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের আর একটি দুর্বল নীতির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে সংসদের অধিবেশনের শুরুতে প্রতিদিন 'বন্দেমাতরম' ও শেষে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' গাওয়া হবে। কিন্তু বন্দেমাতরমে আপত্তি জানাল মুসলিম লিগ ও সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট। মুসলিম লিগ বা কমিউনিস্টদের ভারত মাতার প্রতি কোনদিন কোন শ্রদ্ধা বা অন্তরের টান ছিল না, আজও নেই। মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির দাবিতেই ভারতের বুক চিরে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। তার জন্য মুসলিম লিগ বা কমিউনিস্ট পার্টি কেউ আজও অনুতপ্ত নয়। আজও

ভারত-পাকিস্তান খেলায় ভারত হেরে গেলে মুসলিম লিগের অনুচররা ভারতের যত্রতত্র বাজি পুড়িয়ে আনন্দে নৃত্য করে, ভারত-চীন যুদ্ধ হলে ভারতের কমিউনিস্টরা চীনকে সমর্থন জানিয়ে জেলে যেতেও কুণ্ঠিত হয় না। দরিদ্র বাঙালির মুখের গ্রাস কেড়ে এই সেদিন একলক্ষ টন চাল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কমিউনিস্ট শাসিত দেশ কিউবায় পাঠিয়ে দিল। সুতরাং 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র, যা উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, তা মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব নয় এবং সংসদে 'বন্দে মাতরম' বলতে তাদের আপত্তিতে বিস্ময়েরও কিছু নেই। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল এইটাই যে তাদের আপত্তিতে কংগ্রেসও ওই প্রস্তাব বাতিল করে দিল। জন-গণ-মন নিয়ে যদি আন্না-ডি-এমকে আপত্তি জানাত, তাহলেও হয়তো কংগ্রেস তা মেনে নিত। কিন্তু মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের আপত্তিতে কংগ্রেস যখন 'বন্দেমাতরম' গান বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল তখন 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার পক্ষে সংসদে বলিষ্ঠ সমর্থন জানায় বি জে পি। বি জে পির আপোষহীন জাতীয়তাবাদ ও তোষণ নীতির বিরোধিতা আজ বি জে পি কে কী দিয়েছে তা একবার মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্টদের সমর্থন পাওয়ার জন্য অতি ব্যগ্র কংগ্রেসের জানা দরকার।

১৯৮৪ সালে লোকসভার যে নির্বাচন হয় তাতে মাত্র দুটি আসনে বি জে পি জয়ী হয়। একটি অন্ধ্রপ্রদেশে, অপরটি গুজরাতে। অন্ধ্রপ্রদেশে এন টি রামা রাওয়ের তেলুগু দেশম ও গুজরাতে জনতা দলের সমর্থন না পেলে ওই দুটি আসনও তাদের পক্ষে সেদিন পাওয়া কঠিন হত। কিন্তু মাত্র সাত বছরের মধ্যে লোকসভার দুটি নির্বাচনের মাধ্যমে বি জে পি নিজেকে ভারতের বৃহত্তম বিরোধী দলরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। লোকসভায় এখন বি জে পি সদস্যর সংখ্যা ১২৫। ভারতের চারটি রাজ্যে বি জে পি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে।

ভারতের বৃহত্তম রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে বি জে পি। গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ — সর্বত্র বি জে পি'র সংগঠন বেড়ে চলেছে। এর জন্য শাসক দলের তোষণ নীতি ছাড়া আর কী দায়ী হতে পারে ? রামমন্দির-বাবরি মসজিদ ভাঙার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং বরখাস্ত হয়েছেন, উত্তর প্রদেশ বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাতে জ্যোতি বসুর সমর্থন উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের কতটা কাজে লাগবে ? আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তো উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন কি কংগ্রেসের একটি আসনও বাড়াতে পারবে ? কংগ্রেসের তোষণ নীতি দেশভাগের জন্য দায়ী। আজও কংগ্রেসের দুর্বলতাই বি জে পির পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতকে অবশ্যই সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু সেটা ভারতের সত্তর কোটিরও বেশি মানুষের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ও সেন্টিমেন্ট উপেক্ষা করে নয়।

অযোধ্যা ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রবিবারটা নাকি শুভবার। কিন্তু ৬ ডিসেম্বর রবিবার ভারতবর্ষের বুকে যে ঘটনা ঘটে গেল তারপর আর কী তাকে শুভ বলে দাবি করা যায় ? অযোধ্যায় বেলা বারোটা নাগাদ রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ চত্বরের ওপর মসজিদের গম্বুজের ওপর প্রথম যে হাতুড়ির আঘাতটি পড়ল তা কী শুধুই ইটপাথরের তৈরি গম্বুজটি ভাঙার জন্য ? তা তো নয়। সেই মুহূর্তে একটি হাতুড়ি অনেক অনেক বড় হয়ে অনেক অনেক প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করল জাতির মর্মমূলে। সে হাতুড়ির আঘাতে জাতি তার স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় হয়ে উঠল মূক। ওই হাতুড়ি তো একটি মসজিদকে আঘাত করল না, আঘাত করল একটি চেতনাকে, আঘাত করল একটি আদর্শকে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সমানধিকার, প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা শব্দগুলি কেঁপে উঠল যে হাতুড়ির আঘাতে বারেকের জন্য হলেও বিবর্ণ হয়ে উঠল তার রূপ। সেই বিবর্ণরূপ দেখে আত্মরক্ষা থেকে জেগে উঠল প্রশ্ন, এই কী আমরা চেয়েছিলাম ? এই কী আমাদের নবীন ভারতবর্ষ যার চোখে স্বপ্ন সবার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে প্রবেশের ? না, ওই মুহূর্তে আমরা হেরে গেলাম। পারলাম না অশুভ শক্তির কাছে। পারলাম না বলেই বিজেপির যাঁরা শীর্ষনেতা তাঁরাও বললেন, অথবা বলতে বাধ্য হলেন, না এ এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, এ-ঘটনা আমরা চাইনি। বিজেপি নেতাদের ওই স্বীকৃতির আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না করেও প্রশ্ন কিন্তু করাই যায়, যে নেতৃত্ব তার কর্মীদের অনুগামীদের ওপর নিয়ন্ত্রণের রাশ

রাখতে পারে না, সে নেতৃত্ব যত সৎই হোক, সে নেতৃত্ব ব্যর্থ সে নেতৃত্বের হাতে নিরাপদ নয় কোন দলের ভবিষ্যৎ। সে নেতৃত্বের হাতে নিরাপদ নয় দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎও। বোতল থেকে দৈত্যকে অশুভ শক্তিকে মুক্ত করার পর, সেই অশুভ শক্তির তান্ডব দেখার পর, যখন নেতৃত্ব বলেন, এ অতি দুর্ভাগ্যজনক তখন তা ধর্মের নামে উৎখাত হওয়া, নিহত ও আহত হওয়া মানুষ ও তার পরিবারের কাছে প্রচন্ড উপহাস বলে মনে হয়। যে পাঁচশ বা তারও বেশি মানুষ আজ হিংসার বলি হলেন, তাদের নিহত আত্মা যদি এসে প্রশ্ন করে, কী আমাদের অপরাধ ? কী জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হল, কোন নিধন যজ্ঞের জন্য বলি দেওয়া হল আমাদের, তা হলে কী উত্তর দেবেন নেতৃত্ব ? যে শিশু আজ তার পিতাকে হারিয়ে অসহায় হল, যে বধূর চোখ থেকে আজ সব স্বপ্ন সবুজ মুছে গেল তারা যখন জবাব চাইবে কেন, কেন আমাদের আজ এ অবস্থা ? জানি তখন কোন উত্তর মিলবে না কোন নেতৃত্বের মুখ থেকে। মিললেও তা শোনাবে ব্যঙ্গের মত উপহাসের মত।

ধর্ম মানুষকে কাছে টানে, তাকে কর্মে প্রেরণা দেয়, তার শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করে তাকে সৃজনশীল করে তোলে। কিন্তু সেই ধর্মের নামে যখন মানুষকে উন্মত্ত করে তোলা হয়, তাকে ধ্বংস মাতিয়ে দেওয়া হয় তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করা হয় তখন তা আর ধর্ম থাকে না, তখন সে সর্বনাশা মাদকে পরিণত হয়। কোন সুস্থ রুচি বা বোধের মানুষ কী স্বেচ্ছায় মাদক গ্রহণ করে, যদি না প্ররোচিত হয় ? হ্যাঁ, প্ররোচনাই আজ জাতিকে সমগ্র দেশকে টেনে নিয়ে গেছে এক ভয়ঙ্করের কিনারায়। যেখান থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে, বাঁচাতে পারে, ফেরাতে পারে শুধু শুভ বোধ এবং চেতনা ফেরাতে পারে সম্প্রীতি এবং ভালবাসা।

ইতিহাসের পাতাগুলি যদি দ্রুত ওল্টানো যায়, তাহলে দেখা যাবে হাজার বছর হতে চলল দুটি ধর্মের মানুষ হিন্দু এবং মুসলমান পাশাপাশি থেকে গড়ে তুলেছে একটি দেশ একটি সংস্কৃতি এবং একটি ইতিহাসকে।

সংঘাত যে আসেনি তা নয়, কিন্তু একটা সময় শেষ হয়েছে সংঘাত, বেজে উঠেছে মিলনের, প্রীতির এবং প্রেমের সুর। সেই সুরকে কণ্ঠে নিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছিলাম—এতদিন। নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছিলাম একটি আদর্শকে। কিন্তু একটি শ্রেণীর হঠকারিতায়, কিছু অশুভ শক্তির প্ররোচনায় আমাদের সেই স্বপ্ন—সেই আদর্শ আজ ক্ষতবিক্ষত। সেই রক্তাক্ত ইতিহাসকে নির্মাণ করতে—সংহত করতে উদ্যোগ নিতে হয় আমাদেরই।

আজ কোন মুহূর্তে হিন্দু হয়তো বিশ্বাস করতে পারে না মুসলমানকে, মুসলমান হয়তো আস্থা রাখতে পারবে না হিন্দুর ওপর। কিন্তু শুধু কালের দিকে তাকালেই তো চলবে না—মানুষের শুভবুদ্ধি এবং চেতনার ওপর আস্থা তো রাখতেই হবে। এটা তো ঘটনা—যে হাত অস্ত্র তুলেছে একে অপরের বিরুদ্ধে সেই হাতই আবার এগিয়ে এসেছে অস্ত্রাঘাত থেকে অন্যকে বাঁচাতে। হিন্দুকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে কোন হিন্দু নয়, মুসলমান আবার জীবন দিয়েও মুসলমানকে বাঁচাতে এসেছে হিন্দুই। এদেরই সামনে রেখে গড়ে তুলতে হবে নতুন ভারতবর্ষকে। স্বপ্নের ভারতকে।

মনে হতে পারে এসবই আবেগের কথা। কিন্তু এটাইতো সত্য-শাশ্বত।

দু ই ● অযোধ্যা নিয়ে আজ পর্যন্ত যা ঘটনা-তা যদি খুব নিরপেক্ষভাবে—খুব ঠাণ্ডা ভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে, ধর্ম নয়, স্বার্থই প্রধান হয়ে উঠেছে বারেবারে। ঐতিহ্য, সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার নয়, ধর্মস্থান উদ্ধারও নয়—সেহাতই ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সাধারণের আবেগকে বিপথে চালিত করার এক ঘৃণ্য খেলা শুরু হয়েছে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে। সাম্প্রতিককালে সে খেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি চক্রান্ত যে শক্তি বিশ্বের কোথাও স্থিতি চায় না, যে শক্তির বেঁচে থাকার রসদ জোগান

হয় অন্য দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে তারাই সক্রিয় অযোধ্যাকে কেন্দ্র করেও। দুর্ভাগ্য, বুঝে অথবা না বুঝে সেই শক্তিরই ক্রীড়ণকে পরিণত হয়েছে কিছু কিছু মানুষ, কিছু দল। তারই ফলে জ্বলে উঠেছে আগুন, যে আগুনের উত্তাপ কিন্তু রেহাই দিচ্ছে না সেই সব মানুষ বা দলকেও রেহাই তো দেয়ই না, কেননা আগুন যে সর্বভূক সব কিছুকে গ্রাস করাই যে তার ধর্ম।

অযোধ্যার কথায় ফেরা যাক। একথা তো সত্য রাম কোন স্থান বা কালের সীমায় বদ্ধ নয়। অযোধ্যাও কোন স্থানিক শক্তিতে বদ্ধ নয়। কবির মানসভূমি মানুষের মনোভূমিতেই রামের অধিষ্ঠান সেই মানসভূমিই রামের জন্মস্থান অযোধ্যা। তবে কেন রামজন্মভূমি নিয়ে মাটির অযোধ্যার সন্ধান ? নিত্য আনন্দ, নিত্য সত্যকে ছেড়ে কেন অনিত্যের প্রতি টান ? কেনই বা অমরার দেবতাকে মাটিতে টেনে আনার প্রয়াস ?

মনে হতে পারে এসব প্রশ্ন অবান্তর। তাই ইতিহাসের পথে অগ্রসর হওয়াই ভাল। ১৫২৮ সালে অযোধ্যায় এই মাটিতে বাবর তাঁর শক্তির দম্ভ হিসেবে তাঁর বিজয়ের কীর্তি হিসেবে গড়ে তোলেন এই মসজিদটি। এ মসজিদ গড়ার মধ্য দিয়ে নতুন কিছু অবশ্য করেননি বাবর। নশ্বর মানুষ তো এভাবেই অমর হতে চায়—যুগে যুগে—কালে কালে। সেই ধারাতেই গেছেন বাবর। সেই যাত্রা পথে বাবর কোন মন্দির ভেঙে এই মসজিদ বানিয়েছিলেন কিনা, অথবা সেই মসজিদ বানানোর উপকরণ মন্দির ভেঙে আনা হয়েছিল কিনা তা প্রমাণ করা আজ শক্ত। তবে একথা বলা যায়, তা নিয়ে কমবেশি সওয়া তিনশ বছর কিন্তু কোন সংঘাত বাধেনি। অথবা বাধলেও তার প্রকাশ হয়নি। প্রথম সংঘাতের সময় সিপাহি বিদ্রোহের দু বছর আগে ১৮৫৫ সালে। মুসলমান শাসনের পর তখন ইংরেজ শাসন কায়েম হয়েছে। সেই সময়ই মাথা চাড়া দেয় বিরোধ; সেই সময়ই প্রথম সেখানে পাচিল তুলে মীমাংসার সূত্র দেওয়া হয়। ঠিক করে দেওয়া হয় পূজা এবং

উপাসনার সময়। সেই ধারাতেই ১৮৮৩ সালে সেখানে গড়তে চাওয়া হয় রামমন্দির, কিন্তু অনুমতি মেলে না। চলতে থাকে এইভাবেই।

এরই মধ্যে ১৯৪৬ সালের মার্চে শুরু হয় এক মামলা। তাতে ফৈজাবাদ আদালত ওখানে যে সিয়া সুন্নি সম্প্রদায়ের উপাসনা হয় তার প্রমাণ চায়। সে মীমাংসা হবার আগেই ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে রাতের অন্ধকারে মসজিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় মূর্তি। শুরু হয় এক নতুন বিতর্কের সূচনা। যে বিতর্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে জনসংঘ পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি। এরপর থেকেই যে সব ঘটনা ঘটতে থাকে, তার থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই ক্রিয়াকলাপ আবর্তিত হচ্ছে ভোটের অঙ্ককে কেন্দ্র করে, মসনদের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরার বা প্রতিষ্ঠা করার রাস্তা – অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার বা মেনে নেওয়ার কোন ইচ্ছেই কোন রাজনৈতিক দলের মনের মধ্যে দানা বাঁধে না। দলীয় স্বার্থ রক্ষাই বড় হয়ে ওঠে সেখানে। আর ঠিক সেই কারণেই অযোধ্যা প্রশ্নকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আজ এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের দিকে। বিজেপি যেমন হিন্দুত্ব বাদের শ্লোগান তুলে হিন্দু ভোট কব্জা করে ক্ষমতায় বসার লক্ষ্যে স্থির, জনতা, কংগ্রেস বা বাম দলগুলিও তেমনি হিন্দু এবং সংখ্যালঘু ভোট হারাবার ভয়ে সত্য কথা বলার এক সাহসহীন ঘোড়ার সওয়ার। আর এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতার লোভই—আবার প্রলুব্ধ করেছে অশুভ বিদেশী শক্তিকে। দেশে যারা অস্থিরতা জিইয়ে রেখে, অস্ত্র এবং অন্য কারবারের ফলাও ব্যবস্থা করে তারাও সক্রিয় হয়ে ওঠে অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে। তাদের যোগসাজসেই অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে চলছে এই রক্তাক্ত খেলা, এটা বিশ্বাস করার মত নানা কারণ কিন্তু রয়েছে।

আর ঠিক সেসব কারণেই জাগ্রত করতে হবে শুভবোধকে। বজায় রাখতে হবে শান্তিকে। মেলবন্ধন ঘটাতে হবে মৈত্রীর সম্প্রীতির। ফিরিয়ে আনতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং আস্থা। আর সেই

শুভচেতনা, সেই শান্তি, মৈত্রী, সম্প্রীতি এবং বিশ্বাস ও আস্থার পথেই গড়ে উঠবে নতুন ভারতবর্ষ। যে ভারতবর্ষে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবে না, ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত করবে না হাত। যে ভারতবর্ষকে দেখে ভয় পাবে চক্রান্তকারীরা। রক্তপাত এবং অন্ধকারের মধ্যেই সেটাই আজ আমাদের বাঁচার পথ, আমাদের বিশ্বাসের ভিত, আমাদের অস্তিত্বের শিকড়।

অযোধ্যায় যুদ্ধ এবং যুদ্ধ

জিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের নেপথ্যে

ভারতবর্ষের উত্তর ভাগে তৈমুর বংশীয় জাহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবর ১৫২৮ সাল থেকে ১৫৩০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বাবর ছিলেন ফেরগানার অধিপতি। সাইবেরিয়া থেকে আসা উজবেকরা বাবরকে মধ্য এশিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়। এইসময় বাবরের সমর্থনে এগিয়ে আসেন জিরাটের তৈমুর বংশীয় শাসক। ইনি ছিলেন বাবরের আত্মীয়। বাবর এরপর আসেন আফগানে। এখনকার ভূখন্ডগুলি তিনি দখল করেন। তার মনে কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল ভারত জয়ের স্বপ্ন। ১৫১৮ থেকে ১৫২৪ সালে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন তিনি ও ব্যর্থ হন। এরপরেই তিনি মধ্য এশিয়ার যুদ্ধবাজ, আফগান, এবং গান্ধার যোদ্ধাদের একত্রিকরণ করেন। ১৫২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতবর্ষ আবার আক্রমণ করেন। এইযুদ্ধ ছিল ভয়ঙ্কর। এইসময় দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম শাহ লোদী। বাবর সৈন্য এবার প্রবেশ করলেন। ১৫২৮ সালে পানিপথে শুরু হল ঐতিহাসিক যুদ্ধ। যুদ্ধে বাবর জিতলেন। পানিপথের পর ফতেপুর। বাবর মোঘল শাসনকে সুদৃঢ় করে ফেললেন। এরপরের যাত্রা গঙ্গা উপত্যকায়।

এরপরে শুরু হয় ভারতবর্ষের মাটিতে 'জায়গির' প্রথা। আফগানরা দরাজ হাতে লুঠ করে দেশে চলে গেল। বাকি যোদ্ধাদের বাবর জমি দিলেন। এই পাওয়া সম্পত্তিগুলোই জায়গির নামে চালু হয়ে গেল। বাবর ছিলেন মাত্র ৩ বছর। হিন্দুদের তিনি সেইসময় "বিধর্মী" বলে চিহ্নিত করতেন। হেয়জ্ঞান করতেন। নিজের

স্মৃতিকথায় তিনি এই কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, বাবর আসার আগে অযোধ্যায় বিতর্কিত সৌধ ছিল কি ? হিন্দুদের দাবী ছিল। মুসলমানদের দাবী, ছিল না। বাবরের সময় এই মসজিদ তৈরী হয়েছিল। মূলত সময়কাল নিয়ে অযোধ্যার বিতর্ক শুরু। আমরা শুধু দেখার চেষ্টা করবো, বাবরে'র আগে উত্তরপ্রদেশের অবস্থা কি ছিল ?

ভারতের ইতিহাসে মোঘল সাম্রাজ্যের ঠিক আগে অবস্থান করেছিল, সুলতানশাহীদের আমল। তুঘলক বংশ। এই বংশের শেষ সুলতান মারা যান ১৪১৩ সালে। ১৪১৪ সালে খিজির খাঁ সৈয়দ দিল্লীর সিংহাসন দখল করেছিলেন। ১৪২১ সালে খিজির খাঁ মারা যান। খিজির খাঁ কিন্তু উত্তর ভারতে ঢুকতে পারেননি। তিনি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন দিল্লী, পাঞ্জাব, এবং কায়রোয়। এরপর আসেন মুবারক শাহ। খিজির খাঁর পুত্র। এইসময় উত্তরপ্রদেশে বিক্ষিপ্তভাবে শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। ছিলেন সামন্ত-ভূস্বামীরা। সুলতান শাহীদের আমলে হিন্দুদের জমি ছিল অটুট। রাজপুতদের প্রভাব ছিল যথেষ্ঠ। দিল্লী ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। ইসলামকে এখানে রাষ্ট্রীয় ধর্মে বসানো হয়। এছাড়াও হিন্দুদের উপর কর চাপানো হয। সুলতানশাহীদের আমলে মুসলিম ধর্মগুরু, এবং কবিরা এসেছিলেন বাইরে থেকে। প্রশাসনেও প্রচুর মুসলমানকে নিয়ে আসা হয়েছিল। একমাত্র কৃষক সম্প্রদায় হিন্দুদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। এর বদলে একজন কৃষকও তৎকালীন সময়ে ধর্ম পালটান নি।

ভারতবর্ষে যখন সুলতানদের আমল চলছে। দিল্লীতে যখন ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এইসময়ও অযোধ্যা ছিল। বহাল তবিয়াতেই ছিল। এমনকি সেখানে ধর্মীয় অস্তিত্ব ছিল অটুট। এবার দেখা যাক, অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে আজকের যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাবধারার মূল বিষয় কিভাবে এসেছিল ? প্রকৃত অর্থে অযোধ্যায় কারা ছিল ? কিভাবে উচ্ছেদ হল ?

অযোধ্যায় ভগবান

অযোধ্যা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র। অযোধ্যা প্রসঙ্গে এই বিখ্যাত উক্তি করে গিয়েছেন হিউয়েন সাং। একই কথা বলে গিয়েছেন ফা-হিয়েন। অযোধ্যায় ছিল প্রায় একশো বৌদ্ধ বিহার। বিখ্যাত পরিব্রাজকের উক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন আর এক বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক। তিনি হচ্ছেন, "আলেকজান্ডার কানিংহাম"। কানিংহামের মতে, এখানে অনেক কালো পাথরের স্তম্ভ পাওয়া যায়। এছাড়াও আছে বৌদ্ধ ধর্মের মতাদর্শের নিদর্শন। উদাহরণ স্বরূপ, গৌতম বুদ্ধের মা মায়াদেবী শালপাতা সংগ্রহ করছেন। আলেকজান্ডার কানিংহাম অযোধ্যায় বড় বড় টিলার আয়তন, গঠন নিয়েও গবেষণা চালান। তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, এগুলো হচ্ছে বৌদ্ধ স্তূপ।

ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধ ধর্মমত প্রচার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। এই ইতিহাস আমাদের জানা। অশোকের রাজত্বকাল মোঘল কিংবা সুলতানদের অনেক আগে। ধর্মের নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত রাজনীতি এবং ধর্মবিজয় ছিল অশোকের সামগ্রিক রাষ্ট্রনীতি এবং ধর্মবিজয় ছিল অশোকের সামগ্রিক রাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। যদিও রাজত্বের শেষদিকে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেন। এবং পূর্বের সমস্ত সহিষ্ণুতার নীতি বিসর্জন দিয়ে হিন্দু এবং জৈনদের ওপর বিভিন্ন দমন পীড়ন পর্যন্ত করেছিলেন।

এতো গেল ইতিহাস। অযোধ্যায় হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেও উপদলীয় সংঘর্ষের অনেক উদাহরণ আছে। ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব এবং শৈবদের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ হয়েছিল, কাশীনাথ প্রসাদ রচিত "শ্রী মহারাজ চরিত" বইতে এই ধরণের বহু উদাহরণ আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, এইসময়েও অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধ'র উল্লেখ ছিল। বলা বাহুল্য, আজকের

রাম-মন্দির কিংবা বাবরি মসজিদের দাবী যারা করছেন, তাঁদের কাছে একটাই প্রশ্ন এইসময় বিতর্কিত সৌধের অবস্থানের নেপথ্য রহস্য কি? কি ছিল এখানে ?

হিন্দুরা অযোধ্যা প্রসঙ্গে একটা কথা বারবার উল্লেখ করে থাকেন। এটা হল, রাম মন্দির ভেঙে এখানে বাবরি মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। এই দাবির স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কয়েকটা জরুরী তথ্য দেওয়া দরকার। ১৷ মোঘলরা ভারতবর্ষে আসার পর ভারতবর্ষে প্রচুর মন্দির ধ্বংস করেছিল। এই ধারণা বাস্তব। ঔরঙ্গজেবের আমলে শিয়া মতাবলম্বীদের সমস্ত উৎসবকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত তাঁর হুকুমে হিন্দু মন্দির প্রচুর ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এবং একই জায়গায় মসজিদ বানানো হয়েছে। এর ফলে কার্যত বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় দিল্লী, গুজরাট সহ অন্যান্য জায়গায়। এইসময় মারাঠা আন্দোলন দানা বাঁধে। আওরঙ্গজেবের পতন শুরু হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে শিবাজী কর্তৃক বিজাপুর, বেরার, সন্দেশ, গুজরাট এবং কর্ণাটক অভিযান তো ইতিহাস হয়ে আছে। এই তথ্যে আমি বলতে চাইছি, মোঘল আমলে হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরী করার ঘটনা সত্যি। ২৷ মোঘল আমলে হিন্দু মন্দিরগুলো ভাঙার পেছনে অন্য একটা উদ্দেশ্যও কাজ করতো। তা হচ্ছে, ধন-সম্পত্তি লুঠ। হিন্দু মন্দিরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে সম্পত্তি থাকতো। সেগুলো লুঠ করার পর ভেঙে ফেলা হতো। প্রমাণ লোপাটের পাশাপাশি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হতো মুসলমানদের। ৩৷ অযোধ্যায় বিতর্কিত সৌধ প্রসঙ্গে মোঘল আমলে কোনো উল্লেখই নেই। আগেই বলা হয়েছে, বাবর আসার অনেক আগে থেকেইবিতর্কিত সৌধের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। এবং তা মূলত বৌদ্ধ ধর্মকে সামনে রেখেই। অযোধ্যায় যে'সব পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তাঁর মধ্যে একটা জৈনমূর্তি ও আছে। এটা আবার মৌর্য যুগের। ৪৷ পৌরাণিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামের জন্ম হচ্ছে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ থেকে ২ হাজার সালের মধ্যে। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, অযোধ্যায় ২ হাজার

৭ শত বছর আগে মানুষ ছিল। এখানে ১ হাজার ৩ শত বছরের তফাৎ থেকে যাচ্ছে। এটা অবশ্য বিতর্কিত বিষয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন অযোধ্যার অবস্থিতি লঙ্কার কাছে। অথচ তিনশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে বলা হচ্ছে, অযোধ্যার অবস্থিতি সরযূ নদীর তীরে এর পাশাপাশি ভারতের ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা অনুযায়ী বলা হয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকান্ডের মূল অবস্থিতি হচ্ছে সরযূনদীর পাশে। একই সঙ্গে লঙ্কার অবস্থান বিষয়ও যথেষ্ট সংশয় আছে। বিতর্ক আছে।

অযোধ্যার সমাধান

অযোধ্যায় যুদ্ধ এবং যুদ্ধ। এর সমাধান কিভাবে সম্ভব ? রাম মন্দির না বাবরি মসজিদ ? কোটি টাকার এই প্রশ্নের অস্থায়ী সমাধানের জন্য সর্ব অর্থে ব্যর্থ নরসিমা রাও দারুণ ভাবে সচেষ্ট। মন্ত্রিসভায় থেকেও অর্জুন সিং আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে কবে বসবো ? তৈমুর বংশীয় জহিরউদ্দিন মুহম্মদ বাবরের বংশবদের মত সৈয়দ সাহাবুদ্দিন ইরান দূতাবাসের মাধ্যমে চেষ্টা করছেন, অযোধ্যা ইস্যুকে আরও কতদিন জীবন্ত রাখা যায়। এই অবস্থায় অত্যন্ত সন্তর্পণে, প্রায় গুটি গুটি পায়ে ঐতিহাসিক দাবি নিয়ে এগোচ্ছেন বৌদ্ধরা। এই যখন অবস্থা। তখন অযোধ্যা সমাধান হবে কিভাবে ?

হবে। আক্ষরীক অর্থে অযোধ্যা সমাধান লুকিয়ে আছে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্যে। এর কোনো বিকল্প নেই। হতে পারে না। একমাত্র নির্বাচনই বলে দিতে পারে, মানুষ কি চায় ? অযোধ্যায় যুদ্ধ এবং যুদ্ধের হাজারো প্রশ্নের মধ্যে একমাত্র সমাধান হচ্ছে, ''নির্বাচন''। প্রশ্ন হচ্ছে, ''বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে ?''

অযোধ্যা বিতর্ক : কী ও কেন ?

মানস ভাণ্ডারী

এক

সাম্প্রদায়িকতা তার ভয়ঙ্কর সর্বনাশা শক্তির উন্মাদনা দিয়ে এই পৃথিবীতে বার বার রক্ত বন্যার ঢেউ তুলেছে। সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় জড়িয়ে থাকে। ধর্ম এর একটি অন্যতম ইন্ধন। পৃথিবী থেকে এই কুৎসিত ব্যাধি আজও দূর করা তো যায়ইনি, পরন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় হঠাৎ এর চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে।

ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বারবার শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বে সহবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষকে মুখোমুখি অস্ত্রহাতে দাঁড় করিয়েছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণ ও ষড়যন্ত্রে-ই এঘটনা ঘটে না। সরকার, রাজনৈতিক দল, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকদেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে মৌলবাদ প্রতিহত করার। এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইতিহাস বিকৃত করে, সাম্প্রদায়িক অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশ জাতি ও মানবসভ্যতার ক্ষতিসাধন করে চলেছেন। এঁদেরকে ধর্মতান্ত্রিক সুচতুর ব্যবসায়ী বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিমদের সঙ্গে পাশাপাশি বৌদ্ধ জৈন এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহুদিন বসবাস করেছে। বিভিন্ন সময় তাদের মধ্যে

সংঘর্ষ হয়েছে। এইসব মৌলবাদীর সবার ষড়যন্ত্রে। অনেক সৎ ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠভাবে কাজ করতে বাধা পেয়েছেন। ইসলাম সম্মত এবং হিন্দুসম্মত ইতিহাস না লেখার জন্য স্ব স্ব ধর্মগুরুদের কাছ থেকে নির্যাতিত হয়েছেন অনেক ঐতিহাসিক।

আওরঙ্গজেবকে হিন্দুবিদ্বেষী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি অবশ্য ধর্মান্ধ ছিলেন। কিন্তু হিন্দু মঠ নির্মাণে তিনি সাহায্য করেছিলেন – এ তথ্য সম্প্রতি প্রমাণিত। জিজিয়া করের মতো মুসলমানদেরও 'জাকৎ' দিতে হত কল্হন এবং ইউ এন সিং শৈব রাজাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিরোধ এবং শৈব কর্তৃক বৌদ্ধ শ্রমণ হত্যা – বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন। শৈব কর্তৃক জৈন নিধন, জৈন ধর্মস্থানের দখল নেওয়ার ঘটনা সাতকাহন করে বারবার প্রচার করা হয়েছে ; কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বসবাসের কথা, পারস্পরিক ধর্মীয় সহনশীলতার কথা খুব বেশি বলা হয়নি। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র দারা হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক ছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তমে টিপু সুলতান তার দুর্গস্থিত মন্দিরে পুজো না দিয়ে কোথাও যেতেন না। তিনি বিভিন্ন মন্দিরের জন্য বহু নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। নঞ্জনগৌড়-এ শ্রীকান্তেশ্বর মন্দিরে মূল্যবান রত্ন, হাতি প্রভৃতি উপহার দিয়েছিলেন। দক্ষিণ মালাবার অঞ্চলের অসংখ্য মন্দিরকে তিনি নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। রত্নগিরির ভেঙ্কটরামানা জৈন ধর্ম মন্দির, তিরুমাল মন্দির, পুষ্পগিরি মঠ, গান্ধী কোটাতে অক্রুনাস্বামী মন্দির, গাতুপেট-এর নরসিংহস্বামী মন্দির, মাতুর এর প্রসন্ন ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির, পেরাবলিতে শ্রীরঙ্গমন্দির ইত্যাদিতে টিপু সুলতানের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। শৃঙ্গেরীমঠের শঙ্করাচার্যকে তিনি জগৎ গুরু হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন, নিয়মিত অর্থসাহায্য পাঠাতেন। ১৭৯৩ সালের সামান্য কিছু আগে অথবা পরে একটি চিঠিতে টিপু শঙ্করাচার্যকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন – মঠে শতচণ্ডী জপ এবং

সহস্রচণ্ডী জপ করতে এবং এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। বিভিন্ন সময় বহু মুসলমান শাসক হিন্দু সংস্কৃতিতে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। হিন্দু মুসলমান যুক্ত সাধনা অথবা পারস্পরিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, লোকবিশ্বাস ও লোকধর্মে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব পরস্পর সহাবস্থানকারী ধর্মসংস্কৃতিতে গভীরভাবে মিশ্রিত হয়েছে। তবুও বারবার ধর্মকে কেন্দ্র করেই জ্বলে ওঠে হিংসার আগুন — সর্বব্যাপী দাঙ্গা হয়ে তা ছড়িয়েছে বহুদূর। এর পেছনে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, রাজনীতি যেমন আছে তেমনই আছে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকার একশ্রেণীর ঐতিহাসিক।

দুই

রাম জন্মভূমি না বাবরি মসজিদ ?

এই প্রশ্নটি কেন্দ্র করে সীমাহীন তর্কের লড়াই ও রক্তপাত ঘটেছে বহু বছর যাবৎ। এখনও এর বিরাম তো নেই-ই, বরং চূড়ান্ত এক সীমায় এসে উপস্থিত। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনার কুফল সারা দেশে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়ে ছড়িয়েছে এমনকী দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশেও রক্তপাত ঘটিয়েছে।

দেশি বিদেশি ঐতিহাসিক এবং গবেষকরা অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ ইত্যাদির আলোকে তাদের মতামত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বলাবাহুল্য এঁরা দুটি ধারায় বিভক্ত। কেউ মন্দির, অন্য মসজিদের সমর্থক। দু'টি পক্ষই উচ্চস্বরে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠায় তৎপর। সরকারও বিভ্রান্ত। সমাধানহীন এক বিপন্নতায় তারা অস্থিরমতি।

এই লেখায় আমরা উভয়পক্ষের বক্তব্য বিশ্লেষণ করবো। তাদের যুক্তি ও প্রমাণগুলি নিয়ে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিপাতে প্রয়াসী হবো।

প্রথমেই একটি প্রশ্ন।

রামচন্দ্র কি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ?

না।

তিনি একটি মহাকাব্যের নায়ক।

কোনো সময় হয়তো এই নামে রক্তমাংসের কোনো মানুষ ছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক এই ব্যক্তি-রাম সম্পর্কে ইতিহাসগতভাবে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারেন নি।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রামায়ণ রচিত হয়। এখন প্রশ্ন — রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা-ই কী বর্তমানের বিতর্কিত অযোধ্যা ? কেউ কেউ জোরগলায় প্রচার করছেন — হ্যাঁ, বর্তমানের অযোধ্যা-ই রামায়ণের সেই অযোধ্যা। ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের বিজ্ঞানসম্মত অভিমত অবিসংবাদিতভাবে নাকি একটা প্রমাণ করেছে।

অযোধ্যায় প্রাচীনতম জনবসতির সাক্ষ্য পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে। কিন্তু সেখানে আদিম জীবনযাত্রার প্রমাণ রয়েছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একে নারায়ন খননকার্যের পর জানান যে, অযোধ্যায় সপ্তম খৃষ্টপূর্বাব্দের আগে কোনো জনবসতি ছিল না। কোনো কোনো পুরাণে অযোধ্যার উল্লেখ থাকলেও তার অবস্থান সরযূতীরে নয়, গঙ্গাতীরে। বৌদ্ধ জৈন গ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায়, ভাগবতী সূত্র প্রভৃতিতে উল্লেখিত প্রধান ৬ টি নগর রয়েছে, অযোধ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তা যে রামজন্মভূমি সেকথা বলা হয়নি। হিউয়েন সাঙ অযোধ্যাকে বৌদ্ধধর্মের একটি বড়ো কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন। অযোধ্যায় খননের ফলে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকের পোড়ামাটির জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে। সরযূ নদীতীরে দশরথ যে অশ্বমেধ ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ বর্ণনায় যে ভৌগোলিক বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে নাকি

বর্তমান অযোধ্যার মিল রয়েছে বলে কেউ কেউ দাবী করছেন। রামায়ণে উল্লিখিত ভৌগোলিক বিভিন্ন বর্ণনার সঙ্গে বর্তমানের অযোধ্যার নানা মিল তুলে ধরে এই মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— শ্রীরামচন্দ্র জন্মস্থানের পূর্বদিকে দেবাদিদেবের মন্দির, উত্তরদিকে বশিষ্ঠাশ্রম এবং পশ্চিমদিকে লোমশ মুনির আশ্রম। বর্তমান অযোধ্যায় বশিষ্ঠাশ্রম, লোমশের আশ্রম ইত্যাদি রয়েছে।

বিভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে 'সাকেত' নামের একটি স্থানকে কোশলের রাজধানী বলা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক এই 'সাকেত'-কেই অযোধ্যা বলেছেন। এই মুহূর্তে কয়েকজন গবেষক রামজন্মস্থান হিসাবে সাতটি বিভিন্ন জায়গা চিহ্নিত করেছেন। 'সাকেত' খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে প্রাচীন কোশলের অন্যতম বড়ো শহর। রিস ডেভিডস্ অবশ্য বলেছেন — অযোধ্যা ও সাকেত নামে বুদ্ধের সময়ে দুটি স্বতন্ত্র শহরের অস্তিত্ব ছিল। রঘুবংশের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে সাকেত-ই অযোধ্যা।

ডঃ এ. কে. নারায়ণের নেতৃত্বে ১৯২৫-৪০ অযোধ্যায় তিনটি খননকার্য করা হয়। তারপর ডঃ নুরুল হাসানের নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৪৫-৫০ সালে খননকার্য শুরু হয়। দায়িত্বে ছিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল বি বি লাল। খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হতেই হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এই খননকার্যের ফলে কতকগুলি স্তম্ভ, ইঁট প্রভৃতি পাওয়া যায়। বাবরি মসজিদের সৌধে যে ১৪টি কষ্টি পাথরের স্তম্ভ ছিল সেই স্তম্ভের সঙ্গে এই স্তম্ভগুলির আশ্চর্য মিল পাওয়া গেছে।

মন্দিরবাদীরা যুক্তি দেখান — তথাকথিত বাবরি মসজিদের ১৪ টি স্তম্ভে পূর্ণকলস, বিভিন্ন দেবদেবী, পরী প্রভৃতি রয়েছে। এগুলি একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর শিল্পকলা। যদি ১৫২৮ সালে বাবর এই মসজিদ তৈরি

করান তাহলে অভ্যন্তরে দেওয়ালগাত্রে প্রচুর অলংকরণ রয়েছে – দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি। ইসলামী রীতিতে এটা সম্ভব নয়। রামসীতার খোদাই মূর্তি, দশাবতারের মূর্তি, জন্মবেদি – এগুলি একটি মসজিদের ভিতরে কীভাবে থাকে ? মন্দির সংলগ্ন স্থানে বরাহের মূর্তি রয়েছে যা ইসলামে তীব্রভাবে ঘৃণিত। মসজিদে মিনার, কুয়ো, প্রভৃতি নেই। বরং রয়েছে হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট অনুযায়ী প্রদক্ষিণের জায়গা, গণেশ, লক্ষণ, হনুমানের মূর্তি।

সার্ভে অব ইন্ডিয়ার একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে – মীর বাঁকি অযোধ্যায় রামমন্দিরের স্থানটির ওপরেই মসজিদ নির্মাণ করেন। লক্ষ্ণৌ-র ভূতপূর্ব ট্রাষ্টি ডঃ হুজুর নবাব বলেছেন – আমি মনে করি অযোধ্যা, মথুরা বারাণসী ও লক্ষণপুরী লখনৌ এগুলি সবই প্রথমে মন্দির ছিল, পরে অন্য কোনো শক্তি এসে মসজিদ তৈরি করেছে। ডঃ নুরুল হাসান বলেছেন – নিশ্চয়ই এই মসজিদ ঐ স্থানের মন্দির বিনষ্ট করে নির্মিত হয়েছিল। কোর্ট অব ইন্ডিয়া থেকে ডঃ সি পি রামস্বামী আয়ার লিখিত রিপোর্টে বলা হয়েছে – অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের হিন্দুস্থাপত্য ও ভাস্কর্যগুলি মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীরামের জন্ম ও লালনপালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানটির উপরই একটি মসজিদ তৈরি হয়।

বিক্রমাদিত্য নাকি অযোধ্যায় এসে জঙ্গলাজীর্ণ ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাচীন রামমন্দির আবিষ্কার করেন এবং সেটি পুনর্নির্মাণ করে অযোধ্যায় রাজধানী স্থাপন করেন। এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন কিংবদন্তী রয়েছে। বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় প্রথম শতকে নাকি এই মন্দির পুনসংস্কার করেন। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পাওয়া ৮৪ টি স্তম্ভ ও নবনির্মিত মন্দিরে স্থাপন করা হয়। এই স্তম্ভগুলির গায়ে শ্রীরাম সম্পর্কীয় অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। হনুমানের মূর্তি ছাড়াও রামচন্দ্র ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নর মূর্ত্তিও পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলেন যুধিষ্ঠিরের বহু আগে থেকেই ওখানে

মন্দির ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই মন্দির সংস্কার করেছিলেন।

হিন্দু মুসলমানের অযোধ্যা কেন্দ্রিক দাবির লড়াইয়ের ইতিহাসও বড় পুরাতন।

অযোধ্যা নামক স্থানটি বিভিন্ন সময় পর্যায়ক্রমে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হাতবদল হয়েছে। ১০৩০ খৃষ্টাব্দের আগে সৈয়দ সালার মাসুদী অযোধ্যা দখল করেন। সপ্তম শতকে চীনা পর্যটক হুয়াং চুয়াং পি-কা-শা অযোধ্যা ভ্রমণে এসে দেখেছিলেন সেসময় অযোধ্যায় ১০০ টি বৌদ্ধ মঠ এবং ৫০ টি মন্দির ছিল।

১০৮০ সালে তথাতিগিণ অযোধ্যা আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। ১১৯৪ সালে মুসলিমরা অযোধ্যা দখল করলেও অধিকার কায়েম করতে পারেন নি। হিন্দু বিদ্রোহ তাদের বারবার নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লির লোদী সুলতান অযোধ্যা জয় করেন। কিন্তু হিন্দুরা তাদের মন্দির ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যান।

এরপর বাবর।

বাবর যখন অযোধ্যায় আসেন তখন সেখানকার শাসক ছিলেন বায়াজিদ ফরমুলি। বায়াজিদ প্রথমে বাবরের সঙ্গে যুক্ত হলেও পরে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহীকে দমন করার জন্য বাবর চীনতীমুরকে পাঠান। তার কাছে বায়াজিদ পরাজিত হওয়ার পর ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে ২ মার্চ বাবর অযোধ্যায় আসেন। প্রায় সপ্তাহকাল তিনি এই অঞ্চলে থাকেন এবং মীর ও বাকি তাসখন্দীকে অযোধ্যা শাসনের ভার দেন। এসময় তার হুকুমে বাকি অযোধ্যায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে। কিংবদন্তী বলে, সেসময় অযোধ্যায় একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটি ভেঙ্গে মীর বাকি মসজিদ গড়তে গেলে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। বাকি কামানের সাহায্যে মন্দির দখল করেন এবং সেটি

মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এই যুদ্ধে প্রায় ১.৭৪ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। এই মন্দিরে শ্যামানন্দ নামে এক যোগী থাকতেন। মীর বাঁকি মসজিদ গড়ার চেষ্টা করলে লড়াই কিন্তু চলতে তাকে। নির্মীয়মান মসজিদ বারবার ভেঙ্গে ফেলা হয়। তখন বাবরের নির্দেশে সন্ধি। এমনভাবে মসজিদ গড়া হল যাতে হিন্দুরাও ব্যবহার করতে পারবে। এ সংক্রান্ত তথ্যগুলির বেশির ভাগই নাকি বাবরনামার। এই বইটিও যথেষ্ট বিতর্কিত। বাবরের আত্মকথায় মন্দির ভাঙ্গা বা মসজিদের কোনো উল্লেখ নেই। তুর্কি ভাষায় লেখা স্বয়ং বাবর রচিত 'তুজুক-ই বাবরি' গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আকবর নাকি ৩০ বছর পরিশ্রম করে পার্শি ভাষায় সেটি অনুবাদ করান। বর্তমানে বাবরনামাটি মিসেস বিভারীদের ইংরাজী অনুবাদ। তুজুক-ই-বাবরি গ্রন্থটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এন ইলমিনস্কি প্রকাশ করেন। এটি পরে ফার্সী ফাষায় অনূদিত হয়। সমসাময়িক সময়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে কোথাও মন্দির-মসজিদ বিষয়টির উল্লেখ নেই। আবুল ফজলের লেখাতেই প্রসঙ্গটি নেই। তুলসীদাস অযোধ্যা অঞ্চলেরই লোক। তিনি রামচরিতমানস লেখার সময় অযোধ্যায় এসেছিলেন কিন্তু এবিষয়ের কোনো উল্লেখ করেন নি।

অথচ ইংরেজ শাসক শ্রেণী এবং তাদের সুচতুর ঐতিহাসিকরা এই বিষয়টি নিজেদের প্রয়োজনে যথার্থভাবে ব্যবহার করলেন। ১৮৫৪ সালে এডওয়ার্ড থর্নটন লন্ডন থেকে একটি গেজিটিয়ার প্রকাশ করে জানালেন, বাবরি মসজিদে ব্যবহৃত পাথরগুলি হিন্দু মন্দির থেকে নেওয়া। এমন কি The New encyclopeadia Britarica (VOL.1. 15th Editon, Chicago, Page-751) – তে লেখা হল – There are few surviving monuments of any antiquity. Ram's birthplace is marked, by a Mosque erected by the Mughal Emperor of Babur in 1528 on the site of an earlier temple.

এ এফ বেভারীজ ১৯২২ সালে বাবরনামার অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্যা জটিল করে তোলেন। তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত জুড়ে দিয়ে

মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কথা লেখেন। কিন্তু তার স্বপক্ষে কোনো তথ্য প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি। বাবরের সময় থেকে লাগাতারভাবে মন্দির মসজিদ অশান্তি ও রক্তপাত চলে এসেছে। ১৫২৮ থেকে ৩০ পর্যন্ত ৪ বার ভয়ঙ্কর সংঘর্ষহয়েছে। ১৯২৮ সালে মীর বাঁকির বিরুদ্ধে স্বামী মহেশ্বরানন্দ, হংসবররাজ, রানী জয়কুমারী এবং তিন হাজার মহিলা যুদ্ধে যোগ দেন। এই যুদ্ধে হংসবররাজ নিহত হন। হুমায়ুনের সময় মোট দশবার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে স্বামী মহেশ্বরানন্দ এবং তাঁর নারী বাহিনী নিহত হন। দীবানী আকবরীতে উল্লেখ রয়েছে আকবরের সময় রামজন্মভূমিকে উদ্ধার করার জন্য হিন্দুরা প্রায় ২০ বার আক্রমণ চালায়। ষোড়শ শতাব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি হিন্দুরা মন্দিরের একটা অংশকে স্থায়ী দখল পায়। ঔরঙ্গজেবের সময় অযোধ্যার হনুমানগড়ি মন্দির, নাগেশ্বর মহাদেবের মন্দির ধ্বংস হয়। মোগল সৈন্যের সঙ্গে দশহাজার সাধু, ক্ষত্রিয় ও শিখ বাহিনী যুদ্ধ করে মোঘলদের পরাজিত করে। হাজার হাজার সন্ন্যাসী নিহত হয় এই লড়াইয়ে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর আমীর আলীর নেতৃত্বে মুসলিমরা স্বেচ্ছায় এই জন্মভূমি হিন্দুদের হাতে প্রত্যার্পণের প্রস্তাব জানান। তিনি বলেন, এটি প্রথম থেকেই হিন্দু মন্দির। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে রানী ভিক্টোরিয়ার নির্দেশে জন্মভূমি মন্দির এবং রামচবুতরার মধ্যে একটি দেওয়াল তুলে দরজা বসান হল। এর ফলে মুসলমানরা মন্দিরের ভিতর দিয়ে গিয়ে জন্মভূমিতে নামাজ পড়তে লাগল।

এর পরবর্তী সময়ে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে বারবার কোর্টে মামলা রুজু করা হয়। ইংরেজ আমলেও বারবার দাঙ্গা ও রক্তপাত হয়। এই রক্তপাত বারেবারেই ঘটে চলেছে। সম্প্রতি তার ভয়ঙ্কর উন্মাদনা বয়ে গেল। তার রেশ এখনও স্তব্ধ হয়নি।

তিন

রাম রহিমকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ঘটে যাওয়া এই উন্মত্ত তাণ্ডব আমাদের স্বরূপ আবার নতুন করে চিনিয়ে দিল। বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা আবার হাস্যাস্পদ ও করুণার পাত্র হয়ে উঠলাম।। ভারত নামের একটি অসভ্য বুনো দেশ যেখানে ধর্মের নামে সীমাহীন বর্বরতায় এখনও সর্বব্যাপী দাঙ্গায় রক্তবন্যার ঢেউ ওঠে। — এটা আমাদের জাতীয় লজ্জা, পৃথিবীর সামনে আমাদের দৈন্যতা তুলে ধরলাম।

জাতপাতের লড়াই নতুন নয়, ধর্ম নিয়ে এই পৃথিবীতে বারবার রক্তস্রোত বয়ে গেছে। কিন্তু তা কখনোই মনুষ্যত্বকে উজ্জ্বল করে তোলে নি। আমাদের অগ্রগতিকে এইসব ঘটনা রুদ্ধ করেছে, শুভবুদ্ধিকে লজ্জা দিয়েছে। আমরা নিজেদের কাছেই ছোটো হয়ে গেছি।

যেকোনো দেশেই একাধিক ধর্মাবলম্বী থাকতে পারে। স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মাচরণের অবাধ অধিকার দেওয়া প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আজও মানুষ সেই অধিকার স্পষ্টভাবে পায় নি। পরধর্মসহিষ্ণুতার গুণ আমরা অনেকেই এখনও অর্জন করতে পারি নি।

আজকের এই পৃথিবী যেখানে আমরা সভ্যতা ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতির কথা সহস্রগলায় চিৎকার করে বলি সেখানে ধর্মযুগীয় বর্বর আচরণ সেই ঘোষণাকে ধিক্কার দেয়। একটি মন্দির অথবা মসজিদ নিয়ে দীর্ঘদিনের এই বিতর্কটি আজও আমরা স্বাভাবিক করে ভুলতে পারলাম না। এই ইস্যু কেন্দ্র করে বারবার আমরা আমাদের চারপাশ উত্তপ্ত করে তুলেছি। সেই উত্তাপ এখন দুর্নিবারভাবে ছড়িয়ে পড়েছে গহীন গভীরে। আমরাই তো তাদের এসুযোগ দিয়েছি।

বোতলে একদা বন্ধ এই ভূত অথবা ল্যাবরেটরিজাত ফ্রাঙ্কেস্টাইন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ছিঁড়ে হাতের নাগাল ছেড়ে আজ বেরিয়ে পড়েছে। ভয়ঙ্কর মূল্যমাশুল তো দিতেই হবে।

ভারত নামের এই ভূখণ্ডটির মানচিত্রের সর্বত্র আজ অস্থিরতার তীব্র কম্পন। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক শক্তির বিচ্ছিন্নকামী তাণ্ডব দেশকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে। এর সীমারেখা ভয়ঙ্করভাবে পাল্টে যাওয়ার সম্ভাবনার মুখোমুখি আমরা। দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদ কী শেষপর্যন্ত রুখতে পারা যাবে ?

মৌলবাদী শক্তিগুলি সম্পর্কে সবসময়ই সতর্ক থাকা উচিত। তাদের কার্যকলাপ যখন প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রবিরোধী হয়ে ওঠে তখন সেই শক্তি অথবা দলগুলিকে বিন্দুমাত্র দেরি না করে দমন করা উচিত। দাঙ্গাবাজ কিছু মানুষ সবসময়ই প্রস্তুত হয়ে থাকে। সুযোগমতো এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা তাদের প্রায় পেশায় পরিণত হয়ে গেছে। সুপরিকল্পিতভাবে এই শ্রেণীকে ব্যবহার করেন রাজনীতিক কর্তাব্যক্তিরা। এই কর্তাব্যক্তিরা আবার কখনো কখনো চালিত হন অন্যদেশিয় কোনও অশুভ চক্রের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী।

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে একটি দেশ যখন বেকারি, দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সমস্যায় জীর্ণ শীর্ণ তখন ধর্ম নিয়ে এই বিলাসী খেলা রাজনীতিক এবং দলগুলির কাছে এতখানি জরুরি এবং জীবনমরণ সমস্যা হয়ে উঠল।

আমরা আর কবে বুঝতে শিখবো যে-ধর্ম নয়, প্রকৃত মানবতাই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। হিন্দু-মুসলিম স্বতন্ত্র দুটি অস্তিত্ব নয় — আমাদের সত্তারই একটি অচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্বের মানবজাতি একটি পরিবার।

আসুন, ধর্মের উন্মাদনা নিয়ে নিরীহ জনগণকে যারা ক্ষেপিয়ে তোলে তাদের আমরা চিহ্নিত করি। তাদের প্ররোচনার ফাঁদে যেন

আমরা পা না দিই। 'ধর্ম' নামের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে প্রকৃত ধার্মিক হয়ে উঠি।

সহায়তা গ্রহণ :

1. The Imperial Gazetter of India, VOL.1. Land. 1881
2. V.A. Smith, Akbar, the Great Mughal, Oxford clarendon Press 1919.
3. Encyclopaedia Britanica, Chicago Edition 15th.
4. Hindu Endoument Commission Report, Court of India.
5. The Indian Mushlims, Lond.
6. Mordern Islam in India, A social Ana lysis, Lond.
7. History of Tipu Sultan by Dr. Mahibul Hassan Khan.
8. ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা/গৌতম নিয়োগী।
9. মন্দির মসজিদ সংবাদ/হরপ্রসাদ রায়।
10. রাম রহিম/মানস ভাণ্ডারী।

ধর্মযুদ্ধ বনাম জনযুদ্ধ

৬ ডিসেম্বর - অযোধ্যা নাটক এবং.....

অর্ক চৌধুরী : আগেই বলে রাখি, যে, এই প্রতিবেদক নিয়তিবাদি বা গুরুবাদি দর্শনে বিশ্বাস করেন না। আর এই তথাকথিত বেয়াড়া খ্যাঁচাকলের সেকুলারিজম-এও বিশ্বাস নেই। আসলে মানব বিবর্তনের পথে দীর্ঘ ৮০ হাজার বছর মানুষ নামক এই উন্নত মগজের অধিকারী প্রাণিকুল কাটিয়েছে নেহাতই ধর্মহীন ভাবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এই যেদিন ; যেদিন থেকে ব্যক্তি সম্পত্তির চেতনার উদ্ভব হয়েছে। আর ব্যক্তি সম্পত্তিকে পুঁজিতন্ত্রে ঠেলে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদি জটজালে আবদ্ধ করা পর্যন্ত ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পথে এবং বিভিন্ন উপায়ে। সেও একাধিক জটিল থেকে জটিলতম প্রচেষ্টা। তাতে কখনও কিছু কিছু সুফল পাওয়া গেলেও সামগ্রিকভাবে ধর্ম কখনও সমগ্র মানব সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল চিন্তা করেনি। কোনও ধর্মই আজ পর্যন্ত শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেনি। বরং যখন যেরকম সমাজ রাজনৈতিক দখল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তখন ঠিক সেই সমাজতন্ত্রের খোলস বা মুখোশ চাপিয়ে ধর্মীয় গুরুবাবাজিরা তাদের তথাকথিত আধ্যাত্ম চিন্তাকে রঙীন মলাটে মুড়ে ব্যবসা গুছিয়েছেন। যে খ্রীষ্টপূর্ব পুরাণ, মহাকাব্যের যুগ থেকে পেরিয়ে — জৈন, বুদ্ধ, শংকরাচার্য পার হয়ে এসে এযুগের হাজার হাজার গুরু, বাবা, মহাপ্রভু, ঠাকুর, মোল্লা, ফাদার পর্ব পর্যন্ত ইতিহাসটা সর্বাত্মকভাবেই উচ্চমার্গের চিটিংবাজির সার্বজনীন সর্বকালিক

গ্যাঁড়াকল। এই গ্যাঁড়াতন্ত্র থেকে মুক্ত নন আজকের আমাদের সরকারী গার্জিয়ানরাও। তাঁরা ঠোঁটে চোঙা ঘেঁটে তারস্বরে ধর্মনিরপেক্ষতার কেত্তন গান করেন। আবার বুকে পিঠে নামাবলি এঁটে ছুটে যান বাবাজিদের কোলে চেপে দোল খেতে। আসলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটাই একটা চমৎকার ধোঁকা বাজি। সব ইজমের সব নেতারাই সেই অর্থে ধোঁকাবাজ। চরম ধর্মীয় লম্পট। যে ব্যাপারটা চিরন্তন সত্য হয়ে গেছে সব রঙের ঝান্ডাধারিদের ব্যক্তিগত জীবন প্রবাহে। তা যে লাল, সবুজ, সাদা, কালো, নীল, হলুদ, জাফরান বা যেকোনও মিশ্র রঙের রাজনীতিই হোক না কেন। এরাজ্যের গুটিকয় নকশালপন্থী সমাজবিদকে বাদ দিলে শত সহস্র নেতা, ন্যাতা, কাঁথা যাই ভাবুন না কেন সবাই ওই ধর্মবিশ্বাস নামক বৃহন্নলার মুখোশের আড়ালে নিজের প্রকৃত পাশবিক চেহারাটিকে আড়াল করার কাজে সর্বদা সযত্ন প্রয়াসী। এই অদ্ভুতুড়ে হিপক্র্যাসির কোনও বিশেষ ব্যাখ্যা হয় না। দেখে শুনে, জরিপ করে বুঝে নিতে হয়।

গুটিকয় নকশালপন্থী বলতে আমি বলতে চাই আজিজুল হক, বিপ্লব হালিম, কানু সান্যাল, শৈলেন মন্ডল, বিনোদ মিশ্র প্রমুখ কয়েকজন মাত্র প্রকৃত সামাজিক চেতনা সমৃদ্ধ নির্লোভ মানুষকেই। এদের সংখ্যাটাও দশ আঙুলের গণনাতেই সীমাবদ্ধ। কারণ সমাজ বদল করে ধর্মনামক সুবর্ণময় পাথরবাটিটাকেই মানবজীবন থেকে উৎখাত করার কথা তাঁরাই আজ ভাবছেন সর্বাঙ্গীন নিঃস্বার্থভাবে। বাকি সেকুলার (?) দাদারা যতই মানব শৃংখল, মিছিল, মিটিং-এর ফানুস ওড়ান – না কেন, তা ওই প্রতিবাদের (?) মঞ্চের নিচের ম্যানহোলেই ইতি। দাঙ্গা প্রতিরোধে এঁরা কেউই নেতৃত্ব দিতে পথে নামেন না। যেপর্বে বরং গৃহিণীর আঁচলটাই নিরাপদ আশ্রয়। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটা ওই গঙ্গার জলের মতই। এদেশের গণতন্ত্রটাও তাইই। ওই ঘোলা জলে মরা গরু এবং পচা গলা মানুষের শবদেহও ভাসবে আবার সেই জলেই মহাপুন্য (?)।

অযোধ্যা কান্ডের দুচারটে টিল এবং লাঠির বাড়ি হজম করে, পরে দিন পনের ডুব মারতে হয়েছিল বনে পাহাড়ে। এই সময়টুকুতে অন্য ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা বেশ কয়েকজন রাজনীতিক মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম এই ৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী পর্যায়ের অনুভব এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। আগেই বলে রাখা ভালো এঁরা কেউই আমাদের এই রাজনীতির মূলস্রোতের (?) ঘোলা জলে মাছ ধরতে অভ্যস্ত নন। কেউ সমাজগণতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ত্রাস। কেউ তা না হলেও স্পষ্ট কথাটা অপ্রিয় হলেও মুখের ওপর বলে দিয়েই বুক ফুলিয়ে হাঁটেন রাজনীতির কণ্টকময় পথে। বেশীরভাগ সাক্ষাৎকারই অল্প সময়ের। কখনও তা সামনা সামনি আবার কখনও তা ভায়া মিডিয়ার জটিলতম পথ ঘুরে। এঁরা সকলেই বিভিন্ন এথ্‌নিক মুভমেন্ট-এর শ্রদ্ধেয় মানুষ। আসুন দেখি রাম-রহিম মার্কা ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে এঁরা কে কি ভাবছেন :-

১) শিবু সরেন (দিশম গুরু। ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা) :- রাম এবং রহিমের যুযুধান রাজনীতিটা আসলে আমাদের মতো খেটে খাওয়া মানুষের স্বধিকার চেতনাকে ধ্বংস করার ভেলকিবাজ নাটক। আসলে কে দিল্লির মসনদ দখল করে কোন ধান্দাবাজির পথে শ্রম শোষণ করে মেট্রোপলিশ-এর পিতাঠাকুর হতে চায় তারই ইঁদুর দৌড়। ৬ ডিসেম্বর ছিল বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকারের জন্মদিন। যিনি ভারতের সংবিধান রচনা করেছেন। এই দিনেই 'রাম' বাবুরা সংবিধান ভেঙে মসজিদ ধ্বংস করেছেন। বুঝে নিন ওদের শ্রেণী চরিত্রটি কি ? ওরা কাদের মাথায় রাজনীতির কুড়ুলটা মারতে চান। দিল্লি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। কারণ আমাদের লড়াইটা দিল্লি দখলের নয়। আবার দিল্লি যদি আমাদের বুকে বসে দাড়ি ওপড়াতে চায় তবে আমরাও ওদের টুঁটি ছিঁড়ে নেব।

২) চাচা কেদার মাহাত (বিশিষ্ট ঝাড়খন্ডি বুদ্ধিজীবি) :- অযোধ্যা জায়গাটাকে শুধুমাত্র মানচিত্রেই দেখেছি। বাকিটা জেনেছি তোমাদের লেখা সংবাদ পড়ে। এতটা দূরে থেকেও একটা ভীষণ গা-পাক দেওয়া

অনুভূতি হচ্ছে আমার আমার জীবনের বেশীরভাগ সময়টাই কেটেছে কম্যুনিষ্ট রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে। শুরু পর্বটা সেই ৪০ দশকে। কম্যুনিষ্ট হিসেবে আমি কাজ শুরু করেছিলাম ছোটনাগপুর, সাঁওতালপরগণার এথ্‌নিক গ্রুপগুলোর মধ্যেই। দীর্ঘ ৪০ টা বছর পরে বুঝলাম এদেশের কম্যুনিষ্টদের মত চরম মিথ্যাবাদি, লম্পট, জুয়াচোর, রাজনীতি আর কেউ কোনও যুগে করেনি। উদাহরণ তোমাদের পশ্চিমবঙ্গ। অবশ্য নকশাল আন্দোলনের তিন চারটে বছরকে বাদ দিয়ে কথাটা ধরতে হবে। ওদের সততা, নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগটাকে অস্বীকার করতে পারব না। ওরা হেরে গিয়ে আবার একটা সর্বনাশ করে গেছে। ওদেরকেই সিঁড়ি বানিয়ে আলিমুদ্দিন মার্কা, লালকুর্তারা যা গোছাবার গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ওই ৬ আগষ্টের পরে পরের কটা দিনে সেই ধোঁকাবাজ কম্যুনিজমের বৃহন্নলার মুখোশটা ছিঁড়ে গেল। অপদার্থ প্রধানমন্ত্রী গিলে বসেছেন তোমাদের ওই বৃহন্নলা মুখ্যমন্ত্রীর টোপ গাঁথা একগোছা বঁড়শি। ফল যা হওয়ার হবে।

তবে আমরা প্রস্তুত। ওইসব দিল্লি-কলকাতা মার্কা চিটিং রাজনীতিতে আমরা ফাঁসতে চাই না। আমাদের সামনে (তথা গোটা ভারতবর্ষের খেটে খাওয়া মানুষদের সামনেই) এখন দুটো দানব। একনম্বর রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ। যারা অযোধ্যাকাণ্ডকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির খোলস পরে সারাদেশে জুনটারাজ কায়েম করতে চায়। দুনম্বর জাফরুন রঙের উচ্চবর্ণের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ। যারা শংকরাচার্যের মতো ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে কায়েম করতে চাইছে নযাব্রাহ্মণ্যবাদের মতো শাসন। এরা দুদলই চায় সর্বস্তরের এথ্‌নিক মুভমেন্টগুলোকে জাঁতাকলে পিষে মারতে। এটাই ভারতবর্ষের বেয়াড়া ইতিহাস। আর্য আগ্রাসন এবং তার পরবর্তী যুগের ঘটনাগুলোকে একটু অনুশীলন করলেই বুঝতে পারবে আমি কি বলতে চাইছি। আমরা আর্যেতর সমাজ। শ্রম ছাড়া আমাদের অন্য কোনও পুঁজি নেই। আর

আমরা পুঁজিতন্ত্রে আস্থাশীলও নই। পুঁজিবাদের ধ্বংসটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন : এটাতো কম্যুনিষ্ট চিন্তাধারা। তবে আপনি কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়লেন কেন ?

উত্তর : কে বলেছে আমরা কম্যুনিজমকে অস্বীকার করি ? কথার মাঝখানে বাধা দেওয়াটাও নিশ্চয়ই সাংবাদিকতার এথিক্স নয়।

প্রতিবেদক — ভুল স্বীকার করছি। দুঃখিত। হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে.......

কেদার চাচা :- আমি কিছু মনে করছি না। শুধু বলতে চাই যে তোমরা অর্থাৎ কলকাতার ইয়ং জার্নালিস্টরা ইদানিং খুবই মাথা গরম হয়ে পড়ছ। এটা হয়েছে হরবখত 'আলিমুদ্দিন'-কম্যুনিজমকে আক্রমণ করতে গিয়েই। আরে বাপু ওটা কি কম্যুনিস্ট পার্টি ? ভারতবর্ষে ৭১ সাল থেকে কোনও কম্যুনিস্ট পার্টিই নেই। আর তা নেই বলেই সারা দেশ জুড়ে এই সব রাম-রহিম মার্কা ধর্মযুদ্ধের তান্ডব নৃত্য। এদের রুখবে কে ? ওদের মধ্যে একটা ভীষণ রেজিমেনটেশন আছে। বক্তৃতা দিয়ে আর সত্যাগ্রহের মিছিল করে কি কখনও রেজিমেন্টেড এগ্রেশনকে রুখে দেওয়া যায় নাকি ? তোমাদের রাজ্যে তথা সারা দেশ জুড়েই-ত সেই ইট পূজো। রামশিলা-র সময় থেকেই হাজার হাজার শান্তির জুলুস হয়েছে। তা দিয়ে কি জ্যোতিবাবু, ভিপি, লালু যাদব, মুলায়াম সিং রা মসজিদটাকে বাঁচাতে পেরেছেন ? মাফিয়ারা ওসবে তোয়াক্কাও করেনা। মাফিয়ারাজকে এখানে এই ঝাড়খন্ডের মাটিতে রুখে দিয়েছে আমাদের ছেলে পাল্টা বন্দুকবাজি করে। কিন্তু আমরাতো আর গোটা দেশের রাজনীতির ঠিকা নিই নি। সেটা সম্ভবও নয়। যে নিজেকে বাঁচাতে পারেনা তাকে বাঁচানোর সাধ্য কারও নেই।

এই বলছি আমাদের সামনে এখন দুই নয়া ফ্যাসিবাদের সাঁড়াশি আক্রমণ। কারণ ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করলে সব থেকে আগে গলা

টিপ্‌বে ব্যাপক শ্রমজীবি মানুষের। পি.ভি-র কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে উনি জরুরী অবস্থার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দোসর তোমাদের ওই জ্যোতি বসুজি। হো সকতা জ্যোতিবাবু দিল্লিকা বাদশা বননে চাহতে হেঁ। কিঁউ-কি উও সফেদ ধোতি-ওয়ালা লাল মাস্তানকি বহুত হি ফেরিয়ারিজম কা ধান্দা হ্যায়.....। ফ্যাসিজমকে রুখতে হয়। মনে রেখো প্রিভেনশন ইজ্‌ বেটার দ্যান কিওর। সির্ফ কলম হি নেহি। রাইফেলকো ভি কভি কভি জরুরত হোতা হ্যায়। ....কদম কদম বড়হায়ে যা.....'

সুরজ সিং বেসরা (প্রাক্তন আজসু সম্পাদক। এখন ঝাড়খণ্ড পিপলস্‌ পার্টির সম্পাদক) :- ওরা নির্মলদাকে (শহীদ নির্মল মাহাত) খুন করেছিল। আমরা জ্বলে উঠেছিলাম। আমরা অর্থে ঝাড়খণ্ড মিলিট্যান্ট ফোর্স। আসলে সেদিন যদি আমরা বন্দুক উঁচিয়ে না ধরতাম তবে নিজেরাই খুন হয়ে যেতাম। ওরা অর্থে ওই সব রামজি-রহিমজি মাফিয়ারাবাজ। ওদের ধর্মের ধ্বজা ওড়ানোর রাজনীতিতে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই। আমরা নিজের মাটির অধিকার চাই। তার জন্যে লাখো মানুষের রক্ত ঢালতেও আমরা রাজি।

প্রশ্ন : তাহলে রাইফেল উঁচিয়ে দক্ষিণ বিহারে দাঙ্গা রুখতে গিয়েছিলেন কেন ?

উত্তর : দাঙ্গায় কি আর বাবুরা মরে ? না তাদের ঘরে আগুন লাগে ?

ওরা দাঙ্গা বাধায় খেটে খাওয়া মানুষকে খতম করতে। তাদেরকে মাটি থেকে উৎখাত করতে। আপনাদের কলকাতায় যা ঘটেছে এবার। আমরা ওই কাজটা করতে দেব না। তাই দাঙ্গা আমরা রুখবই। আর তা রুখব রাইফেল হাতেই। অযোধ্যাতে ওরা কি আপনাদেরকেও ছেড়ে দিয়েছিল। কাগজেতো সবকিছুই দেখলাম। আপনি এতোগুলো

বছর ঝাড়খণ্ড আদিবাসিগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লিখছেনও নিজের মতো করেই। আমাদেরকে গালাগালও দিয়েছেন বহুবার। আমাদের ছেলেরা কি তার জন্য কোনও দিন আপনার সঙ্গে এতটুকু খারাপ ব্যবহার করেছে? করেনি। কারণ আমরা বিপ্লবী। গুম্‌পেন নয়। কাগজ সমালোচনা করলে আমরা ভুল-ত্রুটিগুলোকে শুধরে নিতে পারি।

অথচ দেখুন যারা সেদিন অযোধ্যায় ভাঙচুর করল তারাই আবার সাংবাদিকদেরকে বেদম মারল। একশোরও বেশী ফটোজার্নালিস্ট সেদিন মার খেয়েছে। মহিলা সাংবাদিকদেরকেও ওরা মারতে ছাড়েনি। একাজ যারা করেছে তারা নিজেরকে আর্য বলে। ভাবুন একবার আর্য সভ্যতাটা কেমন হতে পারে। ওদেরই রামচন্দ্র যদি রামায়ণ সত্যি হয়, তাহলে সেযুগে আমাদের ওপর কি ধরণের অত্যাচার করেছিলেন?

আমরা অার্য নই। আমাদের মন্দিরও নেই, মসজিদও নেই। আছে কিছু সামাজিক আচার। আমাদের সমাজের মানুষ প্রকৃতির পুজো করে। পাথর, গাছ ইত্যাদির পুজো করে। তাই রাম রহিমের জাহাজ ধরার পলিটিক্সে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই। তবে হ্যাঁ ঝাড়খণ্ডরাজ্য আমাদের চাই। সে দিল্লিতে পি.ভি.-ই থাকুন আর আদবানী-ই আসুন।

আর একটা কথা আপনাদের ফটোগ্রাফারদের আমরা কিছু কিছু গেরিলা ট্রেনিং দিতে রাজি আছি। শুধুই ক্যামেরা হাতে নিয়ে গুম্‌পেনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। আপনারা একটু আধটু বন্দুকবাজিও শিখে নিন। সংবিধানে তা বে-আইনি হতে পারে। কিন্তু আত্মরক্ষার্থে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ অধর্ম নয়। গীতায় সেই কথাই বলছে। মানুষ না খুন করেও বন্দুক চমকানো যায়। তাতে অন্তত

ক্যামেরাটাতো বাঁচবে। ঝাড়খন্ডে আমরা সবরকমের পত্রকারদেরকেই প্রোটেকশন দেব। আপনারা এখানে নির্ভয়ে কাজ করতে পারেন।

বিহারের একজন আত্মগোপনকারি এম.সি.সি জনযোদ্ধা : দয়া করে নামটা প্রচার করবেন না। আত্মপ্রচার নয় সমাজবদলটাই আমাদের মূল কাজ। দেশটাকে টুকরো টুকরো করে নয় অখন্ড ভারতবর্ষটাকেই আমরা দখল করব। আরও পরে সিরিজ অব কালচারাল মুভমেন্টের পথে আমরা বিপ্লব সফল করব। প্রতিষ্ঠা করব ধর্মহীন সমাজবাদ। যা করতে চেয়েছিলেন কম্ মাওৎসে তুঙ।

অযোধ্যায় যা ঘটেছে তা নতুন কিছু নয়। বিধ্বস্ত অর্থনীতি এবং সর্বগ্রাসি রাজনীতিরই চূড়ান্ত প্রতিফলন। আগামী দিনে খেটে খাওয়া মানুষের রক্তচোষার রাজনীতি করতে গিয়ে ওরা এরকমই হাজার হাজার অযোধ্যা কান্ড ঘটাবে। আজও বিহারে ওদের মাফিয়া কিং পিনরা ওরকম ঘটনা ঘটাচ্ছে বেপরোয়াভাবেই। এখানকার প্রাইভেট আর্মিগুলোর অত্যাচারের কথা আপনারা কতটুকু ছাপেন ? অথচ অযোধ্যা বনাম সংহতি বনাম আদবানি-যোশি বনাম বজরং বনাম পি ভি, জ্যোতি, বুদ্ধ, হরকিষেনদের ভোটের বাক্সের রাজনীতি নিয়ে দিন-মাস-বছর মজার গরম করা গল্প ছাপছে আপনাদের মিডিয়াগুলো। যতই আপনারা ফেয়ার পলিটিক্সের কথা বলুন না কেন, মিডিয়া মালিকরাতো সেই পুঁজিরই মালিক। এদেশের ব্যবসাদাররাতো আবার গঙ্গার জল দিয়েই সাবান বানায়। সেই সাবান বেচে আবার প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে চাঁদাও দিচ্ছে। রাজনীতির কি চরম দেউলিয়াপনা। যে গদি বাঁচাতে গিয়ে সেকুলারিজমের সিরনি চড়াচ্ছে, সেই আবার কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ভারতে পূণ্য সঞ্চয় করতে যাচ্ছে পূণ্যস্নান করে। সত্যি সেলুকাস.....। মানুষ মারার কি সব চমৎকার পরিকল্পনা। আপনারা বফর্স-বফর্স করে চীৎকার জুড়লেন। শুরু হল ইটপূজো। সেখান থেকে ভাগলপুরের দাঙ্গা।

বফর্স মাটি খেয়ে গেল। এবার শেয়ার কেলেঙ্কারি পাকড়ালেন। হেডকোয়ার্টার কোথায় ? না বম্বে, সেখানে কাদের রাজত্ব। না শিব সেনার। তাঁদের পিতা ঠাকুর কারা ? না দিল্লির কর্তাবাবুরা। আমি পি.ভি, অর্জুন, আদবানি, যোশিদের কথা বলতে চাইছি আর কি। এঁদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আছেন কারা ? না ওই আলিমুদ্দিনের সরকারি বিপ্লবীরা। অর্থাৎ চন্দন প্রটেকশন ম্যানেজমেন্ট। প্রথম অক্ষরগুলোকে সংগ্রহ করে দেখুন পার্টিটাকে চিনতে পারবেন। সি.পি.এম। আর সেই শেয়ার কেলেংকারির কাগুজে হাওয়াটাকে চাপা দিতে গিয়েইতো এই অযোধ্যার হারে-রে-রে রে। মাঝখান থেকে দাঙ্গার বলি হাজার দেড়েক মানুষ। এরা কারা ? না খেটে খাওয়া লোকজন। মত্তাকরণবাবুদের ভাষায় বলতেই পারেন — মরতেই পারে ওরকম কত হাজারই মরছে, নিত্যদিন। যারা মরেছে তারা নিশ্চয়ই নকশাল। দাঙ্গার সময়ে ঘরে বসে থাকলেইতো পারত ! যাকগে ছাড় এসব। ওরাতো আর আমাদের ভোটার হতে আসবে না কখনও। ভোট আসছে। নোট কামানো শুরু করে দাও। ঝটপট সংহতি ওহবিলের বিলবই কুপন নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ো দিকিনি।

আসলে কি জানেন ভাই আমরা কেউই বিপ্লবের ঠিকা নিইনি। অথচ রাম-রহিম চাচা-ভাতিজাকুল দিল্লির মসনদের ঠিকা নিয়েছে। দেখছেন না এই ধর্মযুদ্ধের ফাঁকতালে মনমোহনের আই.এম.এফ কেওসাটাই সবথেকে জমজমাট ।।

অন্ধ্র এবং দণ্ডকারণ্যের জনযুদ্ধ সি.পি.আই-এম-এল গোষ্ঠী : এটা কোনও বিশেষ কমরেডের বা নেতার নিজস্ব মতামত নয়। বিপ্লবী কম্যুনিষ্টদের বিশ্লেষণ। একটা অযোধ্যাকাণ্ডেই এত হৈ-চৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড ? কই অন্ধ্রের রেড্ডি সরকার যখন আমাদেরকে বে-আইনি ঘোষণা করে ক্র্যাক ডাউন চালাচ্ছিল ; যখন হেলিকপটার থেকে গোটা তেলেঙ্গার জঙ্গলে জঙ্গলে দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে মেশিনগান থেকে বুলেট বৃষ্টি

করছিল, বোমা ফেলছিল তখনতো আপনাদের মিডিয়াগুলির টিকির সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশ্য কলকাতা দিল্লির কয়েকটা কাগজ তখন আমাদের কয়েকটা খবর ছেপেছে। যার সারমর্ম হল কোন্ডাপল্লির সঙ্গে দলের নেতৃত্বের হাতাহাতি (?)। দল ভাঙল (?)। কে.এম. বহিষ্কৃত (?)। জনযুদ্ধ টুকরো টুকরো, নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ (?)। ইত্যাদি। কলকাতায় তখন নকশালবাড়ির রজত জয়ন্তীর উৎসব চলছিল !

৭০ দশকে কলকাতার কাগজগুলো সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদেরকে সমাজবিরোধী বলত। আজকে তাদেরই কেউ কেউ নকশাল বেচে ভালোই কামাচ্ছে। দু-চারজন সখের নকশাল (একদা) বুদ্ধিজীবি আবার ওদেরই ক্রীতদাস বনে গেছেন। সেটাও নজরে এসেছে।

সে যাকগে অযোধ্যা কান্ড আমাদের ঘাঁটি এলাকাতে মোটেই কোনও বিপত্তি ঘটাতে সক্ষম হয়নি। কারণ আমাদের দলমের কমরেডরা এবং মুক্তাঞ্চলের মানুষ রাজনীতিতে শিক্ষিত। ওরা সবাই খেটে খাওয়া সর্বহারা মানুষ। ওদের কোনও জাতও নেই ধর্মও নেই। তাই আদবানি -বুখারি-পি.ভি-অর্জুনদের ডুয়েল লড়াইয়ে আমাদের বিশেষ উৎসাহ নেই। লাভও নেই, ক্ষতিও নেই। কারণ ওঁরা কেউই আমাদের শ্রেণীবন্ধু নন। বরং দুদলই আমাদের শ্রেণীশত্রু। আর ব্যাপারটা দুই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের নিজেদের মধ্যেকার ক্রাইসিস এবং ডুয়েল। একদল হল ইয়েলতসিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল আর একদল বুশ-ক্লিনটনের। তবে এই ধর্মযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যে গোষ্ঠীই দিল্লি দখল করুক না কেন – ফ্যাসিবাদের রাস্তাটাই পরিষ্কার হবে। ভোট সর্বস্ব হাঘরে এবং ভিখিরি রাজনীতির পরিণতি তাই-ই হয়। সাধারণ মানুষ আজ রাজনীতি বিমুখ হয়ে উঠছে। ক্রমাগত মিথ্যাচার, ভন্ডামি, লুচ্চা আর মাতালতন্ত্রের রাজনীতির ব্যাভিচারে জনগণ এখন সামরিক শাসনকেই প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। হয়ত এই তেতো অভিজ্ঞতা

থেকেই তারা একসময় আর্মিকে ডেকে এনে ক্ষমতায় বসাতে পারে। রাম-রহিম তথা ডান-বাম সংসদীয় দলগুলির আজকের রাজনীতি দেশটাকে সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। লুমপেনিজমটাই আজ সরকারি পার্টিগুলোর পেশা।

আসলে মাফিয়ারাজ, পুলিশ, মিলিটারি মানুষের বন্ধু হয় না। মাফিয়ারাতো আর কারবাইন উঁচিয়ে আপনার গালে চুমু দেবে না। সুযোগ পেলেই আপনার পেটে দশ-বিশটা বুলেট ভরে দেবে। সারা বিশ্বের আজকের রাজনীতিতে এটাই জীবন্ত অভিজ্ঞতা। ওইদিনে অযোধ্যায় সাংবাদিক গণধোলাই পর্বটা থেকেই বুঝে নিন আপনাদের সামনে দিনগুলো আগামীতে কালো হবে কি ফরসা হবে ! এদের একদল প্রেস বিল এনে মিডিয়ার গলা টিপতে চায় আবার আর এক দল ডান্ডা মেরে সাংবাদিকদের হাড়গোড় ভেঙ্গে দেয়। আর আপনারা সংহতির বহুরূপী সজ্জার মিছিলের ছবি ছাপেন। ক্রুডিন পলিটিকস্ !

জ্যোতিবাবু বলেছেন – মিলিটারির হাতে বোমা পাইপগানের থেকেও শক্তিশালি অস্ত্র আছে। এতদিনে উনি নিজের বৃহন্নলার মুখোশটা ছিঁড়লেন নিজের হাতেই। বুঝিয়ে দিলেন যে উনি কিসের শাসন চাইছেন মনে প্রাণে। হ্যাঁ সামরিক শাসনটাই ওনার পরবর্তী কর্মকাণ্ড হবে।

অবাক হচ্ছি কলকাতার কিছু কিছু পোড় খাওয়া বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট নেতার বিবৃতি শুনে। এঁরা জ্যোতিবাবুর সঙ্গে এক জোট হয়ে দাঙ্গা রোখার কথা ভাবেন ? নকশালবাড়ির ২৫ বছর বাদে এটাই কি ওঁদের চরম অভিজ্ঞতা ! নাকি বাংলার নকশাল ফোসটার মেরুদণ্ডটাই বেঁকে গেছে ? বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ-এর রাজনীতিটা ওঁরা শিখবেন কবে ?

আলফা ইউনাইটেড লিবারেশন ফোরস ফর অহম :- অযোধ্যার যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের কেউই আমাদের শত্রু নয়। আজকে অযোধ্যার

ঘটনা আবার প্রমাণ করে দিল যে ভারতবর্ষের মাটিতে সব দলই রাজনীতির নামে লুচ্চামি করছে। প্রাণপণে সবাই আখের গুছাচ্ছে। কেউ আখের গুছাতে গিয়ে গদি আঁকড়ে থাকার পলিটিকসে ব্যস্ত। আবার কেউবা গদিটাকে দখল করতে চাইছে। দুদলই অপদার্থ। এঁরা জনসেবার কথা বলেন ভোটের বক্তৃতায়। বুকনিবাজিতেই ভোটের রাজনীতির সফলতা। রাজনীতিতে নীতির দেউলিয়াপনা।

আদবানিরা কেউই রামরথ নিয়ে আসামে আসেন না। আসবেনও না। কেন ? এখানে প্রতিবাদের বেলুন ওড়েনা। প্রতিরোধ হবে। সত্যিকারের পিপ্‌লস রেজিস্ট্যান্স। আমরা বন্দুক হাতেই ওদের বাঁদরামো রুখেছি। আগামী দিনেও রুখব। কারণ আমরা ভোটের ভিখিরি নই। ভারতের সংবিধানটাকে আমরা নিজেদের সংবিধান বলে মনে করি না। স্বাধীন অসমের মানুষ বন্দুকের জোরেই নিজেদের সংবিধান তৈরী করে নেবে। সে সংবিধানে থাকবে মানুষের অধিকার। শোষণহীন সমাজ গড়ার অধিকার। সো-কলড্‌ সেকুলারিজম নয় ধর্মহীন সমাজ বিকাশটাই আমাদের লক্ষ।

আমরা কথা দিচ্ছি স্বাধীন অসমে সংবাদপত্রই হবে জনগণের প্রধান মুখপত্র। অযোধ্যা কান্ডের বাঁদর বাহিনীকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে বলুন। দেখবেন ২৪ ঘন্টায় সব বাঁদরামিকে খতম করতে পারি কিনা।

আপনাদের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতারা চিরকালই ঘোলা জলে মাছ ধরে। কেউ হিন্দু ভোটের কাঙাল, কেউ আবার মুসলিম ভোট কিনতে গামছা পেতে ভিক্ষে করছে। মুখেই কেবল সংহতির বুকনি। ফেরিওয়ালার রাজনীতিতে ব্যস্ত ক্ষমতাসীন দল আর ঠিকাদারি, দালালির রাজনীতিতে রাম রাজত্বের দোহাই দিয়ে ক্ষমতা চাটতে ব্যস্ত আর এক দল। এদের টিট করতে ২৪ ঘন্টার প্যাদানিই যথেষ্ট। ওই ধোলাই হজম করতে পারলে ওরা আর কোনও দিন রাম রাজত্বের কথা মুখে আনবে না।

বক্তৃতা দিয়ে দাঙ্গা রোখা যায় না। সাম্প্রদায়িক সংহতি কথাটাই সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দেয়। সংহতি কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। ওটা অনুভব আর শিক্ষার ফসল। সাম্প্রদায়িক সংহতি সম্প্রীতি কপচাতে কপচাতে একদল একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে তোয়াক্কা করবে। তারা চুরি, জোচ্চুরি, লুচ্চামি, ছিনতাই করলে যদি আর একদল বাধা দিতে যায় তবে তা হয়ে যাবে সাম্প্রদায়িকতা। ভোটের ভিখিরিরা সাম্প্রদায়িকতার সংজ্ঞাটাই জানে না। যেমন জানে না তার নিজের ইজমের সংজ্ঞাটাকেই। দাঙ্গাবাজদের কানে কানে হরিনামের মন্ত্র দিয়ে, কিম্বা তাদের মার্কস, এঙ্গেলসের কোলে চুবিয়ে দিলেই যদি দাঙ্গা বন্ধ হত, তবে এদেশের ইতিহাসটা অন্যভাবে লেখা হত। লুম্পেন প্রলেতারিয়েত বলে কোনও তত্ত্বে আমরা বিশ্বাস করি না। লুম্পেনিজম এদেশে একটা চলমান কালচার। ভোটের কাঙাল নেতারা তাদের ব্যবহার করে। আর লুম্পেনরা দাঙ্গা, হাঙ্গামা, গণধর্ষণ, গণহত্যা ঘটালে আপনারা তারস্বরে চিল্লাবেন। তারপর একটা তদন্ত কমিশন বসবে। ব্যাস মিটে গেল। আমরা ওপথের পথিক নয়। লুম্পেন সন্ত্রাস রুখতে আমরা পাল্টা সন্ত্রাস ঘটাবো। তাতে দু-দশটা লুচ্চা, বদমাস কিম্বা তাদের বাপ অর্থাৎ মন্ত্রী আমলার লাস পড়ে যেতেই পারে। ওদের বন্দুক দিয়ে বুলেট বেরয়। আমাদের বন্দুকের ব্যারেলে কনডোম পরিয়ে রাখতে আমরা শিখিনি। আমাদের ছেলেরা অসৎ নয়। তাই তাদের সাহস আছে। আলফা তাই আজ গৌহাটি থেকে কলকাতা হয়ে দিল্লিরও ঘুম কেড়ে নিতে পেরেছে।

ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ এল.টি.টি.ই সুপ্রিমো :- অযোধ্যা ? চিনি না। দিল্লির রাজনীতিতে আমার কোনও উৎসাহ নেই। ওরা কোনও কালেই ফেয়ার পলিটিক্স করে না। নো কমেন্টস। (ব্যাঙ্ককের একটি বিশেষ সংবাদ সূত্রে প্রাপ্ত। মূল তামিল ভাষা থেকে অনুবাদ)

পত্নু আম্মান ইন্টেলিজেন্স চিফ্-এল.টি.টি.ই :- ব্যাপারটা জেনেছি রেডিও-র খবর শুনে। মূলত বি.বি.সি, ভয়েস অব

আমেরিকার খবরে। বিদেশী টেলিভিশনেও দেখেছি কিছু কিছু। রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় করেছিলেন বলে শুনেছি। তারপরেও মেইন-ল্যান্ডের মানুষ বহুবার লঙ্কা দখল করেছে। তখন লঙ্কার রাজধানীটা কোথায় ছিল বা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয়। আমাদের এখন ওসব কাজ করার উৎসাহ নেই। সময়ও নেই।

সেকুলারইজম বলে কোনও কথা হয় নাকি ? ধর্ম থাকলে ধর্মীয় উন্মাদনাও থাকে। ঠিক তেমনই সম্প্রদায় থাকবে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না ? ধর্মনিরপেক্ষতা বলে কোনও সাবজেক্টিভ থিওরি হতে পারেন। ধর্ম ব্যাপারটা হল মানুষের দেহের এপেনডিক্সের মতই। ওটাকে বাদ দিয়েও মানুষ সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারে। ব্যাপারটাকে তাই ছেঁটে ফেলে দিলেই হয়।

মেইনল্যান্ডের পলিটিক্স সম্পর্কে আমাদের কোনও উৎসাহই নেই। ওরা চিরকালই অনধিকার চর্চা করে। আমরা বিরক্ত। আমাদের লড়াই কলম্বোর রাক্ষস-দানবদের সঙ্গে

(ব্যাঙ্ককের একটি সংবাদ সূত্র থেকে প্রাপ্ত)

অযোধ্যা পর্বের পরে পরে অনেক অনেক সংহতির নাটক দেখলাম। যেসব শহর বা গ্রামে ওই তেতো বিষয়টাকে নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াই নেই সেখানেও অযথা সংহতির-মিছিল-মিটিং করে সংহতির জয়ঢাক বাজানো চলছে এখনও। জন-জীবনে এখন অজস্র নিত্য যন্ত্রনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্মম সংহতি যন্ত্রনা। সাচ্চা ইলেকশন পলিটিক্স। বিগত দু-তিন বছরের দিল্লি-কলকাতার গট-আপ পলিটিক্সের ধাক্কায় ক্যাডারবাহিনীর কোনও কাজ ছিল না। তোলা আদায়ও কমে গিয়েছিল। এই সুযোগে যদি লঙ্কার গুঁড়ো চোখে লাগিয়ে কলাটা মুলোটা পকেটে ঢোকে ক্ষতি কি ? তাতে খোঁচিয়ে খোঁচিয়ে যাক না দর-কাঁচা মেরে।

অনেক রাজনৈতিক দলই ডাক দিয়েছিল তাদের মঞ্চে সংহতির বক্তিমে রাখতে। যাইনি। যাওয়ার ইচ্ছাও হয়নি। কারণ গেলে যা বলতে চাইতাম তা ওরা বলার সুযোগ দিত না। আমরা সংবাদজীবিরাতো আর ওঁদের মতো শ্মশানে গিয়েও গরুর রচনা করতে শিখিনি। অথচ ওঁরা গরুর রচনাটাই আশা করেন।

এরাজ্যের তথা গোটা দেশের তিনটি সংহতির উদাহরণ দিই। পাঠক বিচার করে নেবেন এদেশের সংহতির ধ্বজাধারিদের প্রকৃত চরিত্রটা কি।

গম্বুজ যখন পড়ল ভেঙ্গে

অর্ক চৌধুরী

লিভারের তত্ত্ব আবিষ্কারের পরে আর্কিমিডিস বলেছিলেন-আমাকে একটা লিভার দাও আর পৃথিবীর বাইরে বসার একটা জায়গা দাও। আমি পৃথিবীকে তুলে দেব। লিভারের কি অসম্ভব শক্তি তা নতুন করে প্রমাণ করে দিল এই সেদিন অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর জয় শ্রীরাম এবং তাদের নন্দী-ভৃঙ্গিরা। ওই দিন অযোধ্যা কান্ডের কথাই বলতে চাচ্ছি। আমরা ঐতিহ্যপ্রিয় ভারতীয়রা প্রায়ই দাবি করে থাকি যে পাশ্চাত্যে আবিষ্কার হওয়ার বহু আগেই ভারতের মাটিতে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যাই আবিষ্কৃত হয়ে ঠোঙা হয়ে গেছে। অস্বীকার করছিনা এদেশের মানুষের অর্থাৎ যুব সম্প্রদায়ের উদ্ভাবনী শক্তির অভাব আছে। নেইতো বটেই বরং এদেশে উদ্ভট উদ্ভাবনী শক্তির সংখ্যা খুবই বেশী। উদ্ভট বললাম এই কারণে, যে, আমাদের যুবশক্তির মগজ সম্ভূত উদ্ভাবনী সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি প্রায়শই ব্যবহৃত হয় না। এমনকি এইসব ক্ষুদে প্রতিভাগুলি স্বীকৃতি বা মর্যাদাও পায় না। ফলে প্রায়শই তা ব্যবহৃত হয় ধ্বংসাত্মক কাজে।

যেমনটা হল ওই ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায়। হ্যাঁ অতি সাধারণ লিভার ব্যবহার করেই যেদিন বাবরি মসজিদের তিনটি গম্বুজকে ধূলিসাৎ করা হয়েছিল। সেই লিভারগুলি ছিল শাবল, হাতুড়ি এবং দড়ি। সীমিতভাবে ধ্বংসকার্যে গাঁইতিও ব্যবহার হয়েছে বলে শুনেছি।

মসজিদ ধ্বংসের খবর শুনেই বহুমানুষ লাফ দিয়ে উঠেছিলেন নিশ্চয়ই ধ্বংসকার্যে ডিনামাইট জাতীয় বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে। যাঁরা দু-একবার অযোধ্যায় মন্দির/মসজিদ দর্শন করেছেন

এবং ধ্বংসকার্যের দিন বহুদূরেই ছিলেন তাঁরা এখনও বিশ্বাস করেন না যে অতবড় একটা স্থাপত্যকে বিনা বিস্ফোরকে কয়েকঘন্টার মধ্যে ধ্বংস করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান বলছে যে তা করা সম্ভব। করতে গেলে প্রয়োজন সামান্য বিজ্ঞান চেতনা। সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা এবং কিছু দুঃসাহস। আর এই তিনটি বস্তুর সমন্বয় ঘটিয়েই যেদিন একদল নেশাড়ু মানুষ (ধর্মীয় এবং ড্রাগের নেশায় উন্মাদ) বাবরি মসজিদের তিনটি গম্বুজকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলেছিল।

কিভাবে গম্বুজ তিনটিকে ধ্বংস করা হল ? হ্যাঁ ধ্বংসের ওই মূল সূত্র অর্থাৎ চাবিকাঠিটা লুকিয়ে ছিল ওই গম্বুজ তিনটির চূড়ায়। ওইপর্বে পৌঁছনর আগে গম্বুজ তৈরীর স্থাপত্য শৈলী সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়।

এদেশের স্থাপত্য শৈলিতে প্রাচীন যুগ থেকে তিনটি শৈলি ব্যবহৃত হত। আর্য সভ্যতা এদেশে প্রবেশের আগে এদেশের নগর সভ্যতায় নির্মাণ কার্য হত দ্রাবিড় শৈলিতে। হরপ্পা, মহেঞ্জদরো সভ্যতা অর্থাৎ দক্ষিণভারতের প্রচলিত ছিল দ্রাবিড় শৈলী। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আজও বেঁচে থাকা দক্ষিণভারতের বিশাল বিশাল দেবদেউলগুলিতে। এই স্থাপত্য শৈলী খুবই জটিল জ্যামিতিক তথ্যের দিশারী।

আর্যরা এদেশে নাগর শৈলির প্রবর্তন করেন। এই স্থাপত্য শৈলি আগের মত অস্বাভাবিক জটিল না হলেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং দৃষ্টি নান্দনিক। যথেষ্ট উদাহরণ ছড়িয়ে আছে উত্তর ভারতের বহু মঠ মন্দির এবং গির্জায়। রাজস্থানের প্রাচীন রাজদেউলগুলি দেখলে ধারণাটা স্পষ্ট হতে পারে।

নাগর এবং দ্রাবিড় শৈলির মিশ্রণে সৃষ্টি হয় বেসর শৈলির স্থাপত্য। দুই স্থাপত্য শৈলির যুগগত বিক্রিয়াজাত বেসর শৈলী স্থাপত্য কর্ম অনেকটাই সবল্তা পায় খ্রী. পূর্ব পাঁচ শতক থেকে আরও এগিয়ে

এসে খ্রীষ্টীয় ৮-৯ এবং ১০ শতক পর্যন্ত। উড়িষ্যার দেব দেউলগুলি এই বেসর শৈলীর জ্বলন্ত উদাহরণ।

এদেশের মুসলিম আগমন এবং দিল্লিতে তাদের গুছিয়ে বসার পরবর্তী পর্যায়ে এদেশে প্রবেশ করে আরব দুনিয়ার মরু শৈলির সরলতর স্থাপত্য। আরও পরে এদেশের স্থাপত্য শৈলিগুলির সঙ্গে মিলে মিশে এই মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্যশৈলি পায় এক সমৃদ্ধ রূপ। প্রাচীন বাংলার চারচালা মন্দির। এরই চূড়ান্ত ফসল : ১৪-১৫-১৬-১৭-১৮ শতকের টানা বিবর্তনময় যুগে এই ইন্দো আরবিক (কেউ কেউ বলেন ইন্দো-মঙ্গলয়েড) মিশ্রশৈলির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। সৃষ্টি হয় দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা ফোর্ট, তাজমহল। এরা মিশ্র স্থাপত্য কর্মের যুগান্তকারি সৃষ্টি।

ইন্দো-আরবিক স্থাপত্য শৈলির চূড়ান্ত তত্ত্বের প্রয়োগ হত গম্বুজ নির্মাণের কারিগরিতে। এই গম্বুজ আবার অজস্র খিলান অর্থাৎ আর্চের সমন্বয়ে তৈরী হত। একটি গম্বুজ বা মজবুত খিলান তৈরীতে ব্যবহার হত অজস্র আর্চের নির্মাণ। যাকে বলা হয় মালটিপল আর্চ টেকনলজি। আর্চগুলি আবার গোলাকার বৃত্তিয় পথে গম্বুজ তৈরী করে নির্মাণ করত মুসলিম যুগের প্রাসাদ, জেলখানা, মিউজিয়াম এবং মসজিদ। মূলত বৃত্তাকার অনাড়ম্বর ক্রমশ কেন্দ্রীক (কনসেনট্রিক) নির্মাণেই গড়ে উঠেছে পাঠান মুঘল যুগের মসজিদগুলি। এরকম অজস্র বৃত্তাকার এবং ওপরের দিকে ক্রমশ কৌণিক মসজিদ আজও ছড়িয়ে আছে মালদার গৌড় এবং পাণ্ডুয়াতে।

যেকোনও প্রাচীন মসজিদকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে নীচের দিকে তার গাঁথনির শুরু ৪৮" বা ৫২" পুরু। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা, প্রায় ১৮" ২০" উঁচুতে উঠে এই ঘনত্ব কমতে শুরু করে। মোটামুটি ২৫/২৬ ফিট উচ্চতা থেকে গাঁথনির ঘনত্ব কমে ৪০" থেকে ৩২/৩৫" দাঁড়ায়। (অবশ্যই বড় এবং বিখ্যাত গম্বুজগুলির উদাহরণ ব্যবহার

করছি)। অপেক্ষাকৃত ছোট খিলান বা গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে এই মাপের তারতম্য ঘটে থাকে। তবে গাঁথনির শুরু কখনও ২২"—২৪" ইঞ্চির নীচে নামে না। কারণ প্রাথমিক স্তর থেকে গাঁথনিকে শক্তপোক্ত করাটা গম্বুজ বা খিলান নির্মাণের প্রাথমিক শর্ত।

১০০ বছর আগেও এইধরনের কনস্ট্রাকশনে ব্যবহার করা হত ছোট ছোট নুড়ি ইঁট। গাঁথনির সিমেন্টিং বস্তু ছিল চুন এবং সুরকির মিশ্রণ। এই শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাড়ি তৈরীতে চুন এবং সুরকির ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত। কলকাতা শহরতলির শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি প্রাচীন শহরগুলিতে এধরণের খিলান এবং গম্বুজসমৃদ্ধ বাড়ি এখনও অজস্র টিকে আছে। বালির বিবেকানন্দ সেতু এবং হুগলি জুবিলি সেতুও তৈরী হয়েছে এই খিলান পদ্ধতিতেই। রেলওয়ের অজস্র পুরানো কালভার্ট এমনকি প্লাটফর্ম তৈরীতে বিগত ৬০ দশকেও ব্যবহার হয়েছে খিলান কারিগরি। ব্যারাকপুর রেল স্টেশন যার অন্যতম।

সে যাইহোক ওপরের দিকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় দেওয়াল যখন ওই ৩৫" ইঞ্চি ঘনত্বে এসে পৌঁছয় ঠিক তার অব্যবহিত পরেই শুরু হয় বৃত্তাকার খিলানের গাঁথনি খুবই সাবধানে। গাঁথনি অর্থাৎ আর্চ তার ভূপৃষ্ঠের সমতলে সমান্তরাল ও বৃত্তাকার। কিন্তু লম্বভাবে অর্ধবৃত্তাকার। বাইরে থেকে তাকে দেখায় উল্টানো গামলার মত। আর্চ ক্রমশ ওপরের দিকে উঠে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থমকে দাঁড়ায়। অর্থাৎ একেবারে চূড়াটিতে তখনও ফানেলের মতো একটা গর্ত থাকে। ওই গর্তে বসানো হয় খিলানের মূল চাবিকাঠিটি। যার নাম কি-স্টোন। এ এক জটিল ত্রিকোনমিতি এবং জ্যামিতি বনাম পদার্থবিদ্যার গোলকধাঁধা। ওই কি স্টোনটিই আর্চের প্রাণভোমরা সঠিক হিসেব এবং মাপ মতো না হলে এবং খিলানের সঙ্গে ঠিক ঠিক না আটকানো পর্যন্ত সেযুগের স্থপতি এবং রাজমিস্ত্রিদের দুচোখের পাতা এক হত না।

এই কি-স্টোন তৈরী হত খুব ভালো কোয়ালিটির বিশেষ ধরণের ইট দিয়ে। যে ইটকে পোড়ানো হত বিশেষভাবে যাতে কয়েকশ বছরেও সে ইঁটে নোনা না ধরে বা কোনওরকম ক্ষয় না হয়। চাবি-পাথরে ইটগুলিকে সেযুগে জোড়া দেওয়া হত চুন এবং চিনির রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করে (শোনা যায়)।

কি-স্টোন একবার ঠিক ঠাক খিলানে আটকে দিতে পারলেই নির্মাণের কাজ ১০০শতাংশ সফল। (প্রাচীন মন্দির নির্মাণে মন্দির চূড়ায় এই কি-স্টোন সেটিংকে বলা হত কলস স্থাপন), আগেই বলেছি যে আর্চের প্রাণভোমরাটি হল এই কি স্টোন। বলা চলে স্থাপত্যের মর্মর প্রতিমার কেন্দ্রই হল আর্চের এই চাবি-পাথর। এবং কি-স্টোনের চারধারে এসে আর্চ বৃত্তের কেন্দ্রীক (কনসেনট্রিক সার্কল) গতি একেবারে রুদ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায় তখন এই বহুশত খিলান(মালটিপল আর্চ) কে ধরে রাখায় কাজটি করে ওই কি-স্টোন। কাজটিতে অতি সূক্ষ এবং দক্ষ কারিগরি কুশলতার প্রয়োজন। তার সঙ্গে চাই শিল্পীর ধৈর্য্য, কঠিন পরিশ্রম এবং মননশীলতা।

এই চাবি-পাথরই গম্বুজ এবং খিলানের ধারক এবং বাহক বিশেষ। যা একবার তৈরী (সেটিং) হয়ে গেলেই খিলানটি বহু শতাব্দীর জন্য নিরাপদ। অর্থাৎ কি-স্টোন তখন দুপাশে সমান বল এবং সম ঘনত্ব বিশিষ্ট চাপ দিয়ে খিলানটি বা ভীষণ ভারি গম্বুজের উল্টানো গামলাটিকে ধরে থাকে ভূমির সঙ্গে নিজে আলম্ব অবস্থানে ঝুলে থেকে। চাবি-পাথরের মাথায় যতই চাপ পড়ুক (সাধারণত নির্দিষ্ট লোড ক্যাপাসিটি) না কেন তাতে আর্চের বিশেষ ক্ষতি হয় না। বরং গাঁথনি শুকিয়ে গেলে ওপর থেকে চাপ দিলে চাবি পাথর তার দুপাশে বৃত্তাকারে সে চাপকে পরিবাহিত করে দ্বিগুণ বেগে এবং আর্চ আরও দৃঢ় হয়।

সেই অর্থে একটা সাধারণ আর্চও তার চূড়া এবং আশে-পাশে বহুশত মানুষের ওজন বইতে সক্ষম।

অযোধ্যার ভূপতিত তিনটি গম্বুজকে দেখেছি বহুবার। বেশ বোঝা যেত তাদের চাবি-পাথর ছিল নিটুট এবং প্রতিটি গম্বুজ অন্তত ১০,০০০ মানুষের ওজন সহ্য করেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নিশ্চিন্তে। অর্থাৎ তিনটি গম্বুজের মাথায় অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করতে পারলে যে কোনও মন্ত্রী ওই মঞ্চে ৩০ হাজারি জনসভা করতে সক্ষম হতেন। মসজিদের ধ্বংসকর্তা বাবাজিরা বাবরি মসজিদের এই থিয়োরিটা জানতেন ভালোই।

যে কোনও খিলানকে ভূপতিত করতে গেলে (বিস্ফোরক ব্যবহার না করে) ওই চাবি-পাথরটিকে অক্ষত রেখে তার ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আবার ওপর থেকে আঘাত করে কি-স্টোনকে নড়ানোও সম্ভব নয়। তাই গম্বুজ ভাঙার একমাত্র উপায় হল কি-স্টোনটিকে উপড়ে ফেলা। ওটিকে কোনওরকমে উপড়ে ফেলতে পারলেই, গোটা গম্বুজটা হুড়-মুড় করে পড়ে যাবে। অন্যথায় গম্বুজকে ফেলতে গেলে তার ভিত থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। যা প্রচুর শ্রম সাপেক্ষ এবং তাতে ঝুঁকিও বেশী। একথাটাও অপরাধীরা জানত ভালই।

আগেরবার মসজিদের মাথায় গেরুয়া ঝান্ডা ওড়ানোর সময়ও গম্বুজগুলি ভাঙার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তখন সঠিক ব্যাপারটা না-জানা থাকার দরুণ অথবা সময়ের অভাবে ধ্বংস কাজ সম্ভব হয়নি। তাই এবার হনুমান কাহিনী কাজে নেমেছিল কোমর বেঁধে। এবং পরিকল্পনাটি ছিল টপ সিক্রেট, সম্ভবত এই পরিকল্পনার কথা আদবানি, যোশি এবং বাজপেয়ী ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি। পারলে এবারের করসেবার ঝুঁকি তাঁরা নিতেন না।

অন্যদিকে ধ্বংসকার্যের ব্লুপ্রিন্ট তৈরী হয়ে যায় ঘটনার কয়েকমাস আগে। একটি সংবাদসূত্র জানাচ্ছে চাবি পাথর উপড়ে গম্বুজ তিনটিকে ধ্বংস করার ব্লু-প্রিন্ট চূড়ান্ত করা হয় গত জুলাই মাসে। কাজ করার জন্য দক্ষিণ ভারতের তিনটি প্রদেশে তৈরী করা হয় তিনটি বিশেষ কমান্ডো বাহিনী। এরা ত্রিস্তর যুক্ত। বলা চলে বজরং এবং শিবসেনার

সুইসাইড এ্যাকশান ফোর্স। বা কামিকাজে বাহিনী। যাদের মূলমন্ত্র হল মন্ত্রের সাধন নতুবা শরীর পতন। তিনটি বাহিনীর দুটির দায়িত্ব নেয় শিবসেনা। এদের দুটি স্তরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় দুই মেরুর ২টি বিশেষ দায়িত্ব। (১) প্রথম দলটি ওপরে উঠে পলেস্তারা ছাড়িয়ে কি-স্টোন খুঁজে বের করবে। (২) এবং দ্বিতীয় দলটি চাবির চারপাশে পুঁতে দেবে বিশাল বিশাল ইস্পাতের শাবল। এই কাজ শেষ করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। তাই নিরাপত্তারক্ষীদের চুপচাপ থাকার ব্যবস্থা করবে পদস্থ আমলারা। কাজ চলাকালিন একাধিক ছোট ছোট স্কোয়াড গম্বুজের ওপরে উঠে পতাকা হাতে উদ্দাম নৃত্য করে যাবে। চীৎকার করে শাবলের ওপর হাতুড়ি মেরে শাবল পোঁতার ধাতব শব্দকে চাপা দেবে। (৩) শাবল পোঁতার কাজ চলার সময়ে গম্বুজের দুইপাশ এবং পিছন দিকে অপেক্ষা করবে তৃতীয় দলটি। এরা প্রথম সুযোগেই জমিতে পুঁতে রাখবে শক্ত পোক্ত কয়েক ডজন ইস্পাতের খুঁটো। চাবি-পাথরের চারপাশে শাবল গাঁথা। অন্তত তিনফুট লম্বা তীক্ষ্ণ শলাকা যুক্ত মজবুত ইস্পাতের লিভার। চৌকো এবং গোলাকৃতি যাদের মাথায় ১০ পাউন্ডের হাতুড়ি মেরে কাজ হাসিল করতে হবে। শেষ হলে তৃতীয় দল নীচ থেকে শক্ত দড়ি ছুঁড়ে দেবে ওপরে। দ্বিতীয় দল শাবলগুলির সঙ্গে ছড়ির একপ্রান্ত বেঁধে দিয়েই চকিতে সরে যাবে পাশের গম্বুজের ওপরে। নীচ থেকে তৃতীয় বাহিনী প্রাণপণে দড়িতে টান দিয়ে শাবলের ওপর কেন্দ্রীক চাপ প্রয়োগ করে উপড়ে ফেলতে গম্বুজের কি-স্টোনকে। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে গম্বুজ। একেবারে পেশাদারি পরিকল্পনা এবং পেশাদারি কাজ। তিনটি বাহিনীর কোনও সদস্যই অপর দলের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। দড়ির টান শুরু করার নির্দেশ আসবে ওপর থেকে সমবেত এবং একই কণ্ঠে জয় শ্রী-রাম ধ্বনিতে। নীচের ফোর্স — হর-হর-ব্যোম ব্যোম ধ্বনি দিয়ে কাজ শুরু করবে।

সংবাদ সূত্রটি জানাচ্ছে এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত ব্লুপ্রিন্টটি অনুমোদন হয় মোট নজন সর্বোচ্চ নেতার ধ্বনি ভোটে। যাদের মধ্যে ছিলেন

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীযুক্ত সিংঘল এবং উত্তরপ্রদেশের দুই প্রথম শ্রেণীর সরকারি আমলা ব্লু-প্রিন্ট অনুমোদিত হওয়ার পর দীর্ঘ তিনমাস ধরে তিনটি স্কোয়াডকে শিক্ষিত করা হয় মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রে। দ্বিতীয় পর্বে গত অক্টোবরে কর্নাটকের কোনও এক পাথরে পার্বত্য এলাকায় তিনটি দলকেই একত্রে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল হাতে কলমে। সেই ক্যাম্পের মেয়াদ ছিল ১৫ দিনের। মোট তিনশ বলিষ্ঠ যুবক এইকাজে ট্রেনিং সমাপ্ত করে, পরিকল্পিত উপায়ে পাথরে শাবল বসিয়ে দড়ি টেনে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই উপড়ে দেয়। তুলনায় মসজিদের ইঁটের দেওয়ালে শাবল গাঁথা অনেক সহজ।

সূত্রটি আরও জানায় যে, এই পরিকল্পনার ব্লু প্রিন্ট তৈরী করেন রেলওয়ের তিনজন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার, এবং চূড়ান্ত রূপ দেন দিল্লিস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এক স্থপতি। যিনি নাকি দিল্লি সিটি প্ল্যানিং-এর একজন কর্তাব্যক্তি (পদস্থ আর্কিটেক্ট)। তাঁদের নাকি কথা দেওয়া হয়েছে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে ওঁদের বসানো হবে প্ল্যানিং কমিশনের উচ্চতর পদে।

মহারাষ্ট্রের একটি শিল্পপতি গোষ্ঠি এই কাজের জন্য দু-কোটি টাকা অফার করেছিল। এরাহি চূড়ান্ত এ্যাকশনের জন্য বিশেষ ধরণের ইস্পাতে তৈরী শাবল এবং কাছি (দড়ি) সরবরাহ করে অযোধ্যায়। বিশাল টাকার অফার কিন্তু ওই চার ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যাখ্যান করেন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই। কারণ তাঁদের রামভক্তি এবং সিংঘল প্রেস। এঁরা বিশ্বহিন্দু পরিষদের দীক্ষিত এবং গোঁড়া সমর্থক। খবর সংবাদ সূত্রের।

বিখ্যাত/কুখ্যাত ৬ আগস্ট : এদিন সকাল নটা পর্যন্ত সাংবাদিকরা জানতেন যে পর্বত মূষিক প্রসব করবে। পূর্ব ঘোষণা মতো করসেবা হবে প্রতীকি। কারণটা বোধহয় বিগত একবছরে দিল্লিতে পি.ভি. সরকার ভজনা এবং বামপন্থীদের সচল গট-আপ রাজনীতি। অযোধ্যায় উপস্থিত সব সাংবাদিকই এই চুহা পয়দা-মার্কা কপি যখন লিখছেন তখন ফৈজাবাদের এক লজে পরিষদের এক জঙ্গি

নেতা চাপা স্বরে হুংকার দিয়ে উঠলেন – ''কাল শুভাসে দেখাওঙ্গা শালা পত্রকার লোগকো।'' তুমলোগ শালহা দেখেঙ্গে, আঁখ ভরকে দেখেঙ্গে – চুহা পায়দা হোতা হায় ক্যা বিল্লি পায়দা হোতা হ্যায়। বজরং শের কা বাচ্চা হ্যায় শের হি পায়দা করেগা ...।''

মসজিদ চত্বরে অহিংস করসেবা দেখতে গিয়ে সংবাদজীবিরা বুঝে এসেছেন বজরং এবং শিব সেনা কি ধরণের ভয়ংকর জীব। অবশেষে পয়দা হয়েছে হিংস্র দানব।

পরিষদের সহ সভাপতি ভোমনিওয়ালের কথামতো করসেবকরা সেদিন সরযূ নদীর ধারে রামলীলা ময়দানে সমবেত হয়নি। আর মুষ্টিবদ্ধ বালু গর্তে ঢেলে বা দেওয়ালে চুন মাখিয়েও করসেবা শেষ হয়নি। ব্লু প্রিন্ট মতো কামিকাজে কমান্ডো বাহিনীর তিনটি দলই মন্ত্রের সাধন করেছেন। এবং ওপরওলার নির্দেশ মতো পুলিশ বা সি. আর.পি একটি টিয়ারগ্যাসের শেল বা গুলিও ছোঁড়েনি বা লাঠিও চালায়নি।

বিনয় কাটিয়ার ৫ ডিসেম্বর সব সমিতির মিটিংয়ে ঘোষণা করেছিলেন – প্রতীকি করসেবা কারোরই পছন্দ নয়। ...পরে সম্ভবত তারই নির্দেশে করসেবকদের এগিয়ে নিয়ে এসে রাখা হয় রামকথাকুঞ্জে।

বেলা দশটার কিছু পরেই কুঞ্জ বরাবর রাস্তায় জমা হতে থাকে হাজার হাজার মানুষ। সামনেই 'রামদিওয়ার'। দিওয়ারের ওপর আর.এস.এস. এর বাছাই করা লাঠিধারি বাহিনী সংঘের ইউনিফর্ম পরে পাহারারত। রামকথাকুঞ্জের চত্বরে মঞ্চ ঢালাই করা সুসজ্জিত পূজাবাসর। রক্তবর্ণ স্বস্তিকা শোভিত তামার ঘট। চারপাশে ফুল এবং আম্রপল্লবের মাঙ্গলিক সজ্জা। বেলা ১২-১৫ মিনিটে এখান থেকেই সন্ন্যাসিরা শুরু করবেন প্রতীকি করসেবা এবং রাম আরাধনা। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখবেন সুপ্রীম কোর্টের প্রতিনিধি তেজ শঙ্কর।

এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। গোলমাল শুরু হল প্রায় পৌনে এগারটা নাগাদ হনুমানগড়ির দিক থেকে আক্রমণ শুরু হল। ব্লুপ্রিন্ট মতো সীতা রসুইভবনের ভেতরে কোনও গোপন ঘরে জমা করে রাখা হয়েছিল বিশাল দৈর্ঘ্যের প্রচুর শক্ত কাছি, শাবল, হাতুড়ি এবং ছেনি। ওই ভবনের ভেতরেই গোপনে অপেক্ষা করছিল দুটি কামিকাজে বাহিনী। যথাসময়ে তাদের সঙ্গে দেখা করলেন চার ইঞ্জিনিয়ার। আওয়াজ উঠল জয় শ্রীরাম। আগের থেকেই ঠিক ছিল ফটোগ্রাফার এবং ক্যামেরাম্যানদের রুখতে হবে। এঁরা সরকারি কর্মচারি। তাই কাজ তদারকির সময়ে যেন লেন্সে ধরা না পড়ে যান। চার ইঞ্জিনিয়ারকে মাঝে মাঝে। সাধারণ পোষাক পরিহিত, যেন তাঁরাও করসেবক জনতা। দুটি বাহিনীর দুশজন কমান্ডো প্রথমে চাপ সৃষ্টি করে হৈ চৈ বাধায় হনুমানগড়ি-র কোণায়। তাদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় আর.এস.এস. কর্মিদের। সম্ভবত আর.এস.এস. স্বেচ্ছাসেবকরা কেউই জানতেন না আসল পরিকল্পনার কথা। জানলে তাঁরা বাধা দিতে যেতেন না। খানিক পরে ওপরতলার নির্দেশ পেয়ে তাঁরা জঙ্গিদের পথ ছেড়ে দেন। শুরু হল জয় শ্রীরাম হুংকার। আওয়াজ উঠল হর-হর-ব্যোম-ব্যোম। জঙ্গিরা দ্রুত পথ হেঁটে চারজন ইঞ্জিনিয়ারকেই আরও দ্রুত ওপরে তুলে দিয়ে নিজেরাও ওপরে উঠে গম্বুজের দখল নিল। এর পরই সিংঘলের সঙ্গে হনুমানগড়ির রাস্তা অর্থাৎ সীতা-রসুই ভবনের কোণার পথ দিয়ে সিংঘলের সঙ্গে এ্যাকশান পরিদর্শনে এলেন শিবসেনা সাংসদ এম.সাভে.। দুজনেই প্রথমে হাত তুলে উইশ করলেন খাঁচার ওপরে নৃত্যরত দুই একশাণ কমান্ডো বাহিনীকে। মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা তৃতীয় বাহিনী আওয়াজ তুলল — হর হর শংকর — জয় মা ভবানি। সিংঘল চীৎকার করলেন রুদ্র দেবতা — সমস্বরে গগনবিদারি কণ্ঠ-বিস্ফোরণ-জয় জয় কালি। দুরন্ত গতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল এবার। ওপরে এবং নীচে। উত্তরের রাম কথাকুঞ্জের আঙিনা এবং সীতা রসুই ভবনের পিছনের জমিতে দূরে পোঁতা শুরু হল বড় বড় শক্তপোক্ত লোহার খুঁটি।

সিংঘলের পাশে দাঁড়িয়েই সাভে হাতমুঠো এবং বুড়ো আঙুল তুলে শরীর ঝাঁকালেন। হিন্দি ফিল্মের হিরোর ভঙ্গিতে। যার অর্থ 'ডান'। কাউবয় পোশাকে প্রায় একডজন হনুমান সেনা গান জুড়ল – অব তো দিল্লিবালেকো দুনিয়া দেখাউঙ্গা ··· হাতুড়ি এবং ছেনি ঠুকে ভাঙা সুরু হল গম্বুজের নির্দিষ্ট জায়গার পেটাইকরা পলেস্তারা। কি-স্টোনের অবস্থান ফিতে দিয়ে মেপে ইঞ্জিনিয়াররা আগেই একটা বড় বৃত্ত এঁকেছিলেন গম্বুজের মাথায়। নীচে ফটোগ্রাফাররা তৎক্ষণে দ্রুতহাতে ক্যামেরার মোটর দাবাচ্ছেন। বিকট চীৎকারে মোটরের ক্ষীণ আওয়াজ ডুবে যাচ্ছে। একজন ইঞ্জিনিয়ার ধমকে উঠলেন – অভি অভি ও শালা ক্যামেরাম্যানকে রোকো। নেহিতো ··· ওপর থেকে নির্দেশ পেয়ে নীচের বাহিনী বাঁশ এবং লোহার শাবল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রেসের ওপর। সঙ্গে যোগ দিল প্রায় হাজার খানেক জনতা। শুরু হয়ে গেল প্রেস গণ ধোলাই। নির্দিষ্ট কাজ শেষ করে ইঞ্জিনিয়াররা আশ্রয় নিলেন প্রথম এবং মাঝের বড়গম্বুজের মাঝখানে। এখানে বেশ কজন জঙ্গি সেবাইত তখন বেশ কয়েকটি বড় কলকেতে গঞ্জিকায় আগুন ধরাচ্ছেন। গাঁজায় হলুদ ধোঁয়া ভেদ করে বাতাসে বুদ বুদ ছড়ালো আগুনের ফুলকি। তারওপর ঢেলে দেওয়া হল সাদারঙের পাউডার। বোঝাই যায় ওটা কোনও বিশেষ ধরণের উত্তেজক ড্রাগের গুঁড়ো। গম্বুজের ওপরে তখন ছেনির ওপর ঠকা-ঠক্ হাতুড়ি পড়ছে। যেমন যেমন প্লাস্টারে ফাটল ধরছে তেমন তেমন পলেস্তারার চাকলা ছাড়িয়ে সেবকরা ছুঁড়ে ফেলছে নীচে। বাধার প্রাচীর ভেদ করে তৎক্ষণে বেশ কয়েকশ তজ্জুগে মানুষ উঠছে ওপরে আরও ওপরে। জঙ্গিরা অবস্থা বেসামাল হতে দিতে চায়না। ওঠার মুখেই লেঙ্গি মেরে বা ছোট-খাটো পুশ-পুল্ মেথডে হুজুগে লোকগুলিকে ফেলে দিতে শুরু করল নীচে। একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ আবেগ তাড়িত কণ্ঠে আবেদন

করলেন — রামজি কি দুহাই। হ্যমে, আপকে সাথ কাম করনে দিজিয়ে বাবু --

— জলদি জলদি নীচে উতার যাইয়ে। উর নীচেবালা সেবককে সাথ বলি পাকড়িয়ে। ইধার জায়গা য্যাদা নেহি হ্যায়। লেকিন কাম ও বহোত করনা হ্যায়। য্যাদা আদমি আনেসে সবকুছ গরবর হো যায়গা। চলিয়ে চলিয়ে আউর। নীচে উতারিয়ে। হর হর শংকর --- জয় মা ভবানি। এক অতি উৎসাহি যুবক হাঁক পাড়ল — ভোলে ব্যোম-তারক ব্যোম। বাবা তারকেশ্বর সংস্কৃতি। অপর একজন উত্তর দিল — শালা কি শক্ত রে। প্লাস্টার না পাথর ? — এ বাবা ব্রিটিশের কনস্ট্রাকশন। মার মার ছেনি মার। নাহলে ভূতগুলো আমাদেরকেও নামিয়ে দেবে — প্রথম গম্বুজের ওপরের দিকের বিস্তীর্ণ এলাকার পলেস্তারা ততক্ষণে ছাড়ানো হয়ে গেছে। যারা পলেস্তারা ছাড়াচ্ছিল তারা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছে দ্বিতীয় গম্বুজে। বিকট হৈ-চৈ। তিন ইঞ্জিনিয়ার এবার এখানে উঠে এসে শাবল গাঁথারস্থান নির্দেশ করলেন ছেনির ওপরে হাতুড়ি ঠুকে। শুরু হল নির্দিষ্ট জায়গাগুলিতে শাবল বসিয়ে তার ওপরে হাতুড়ির আঘাত। তিন কৌণিক বিন্দুতে শাবল গেঁথে তাদের মাথায় হাতুড়ি পিটছে ছজন যুবক। পরিশ্রম এবং উত্তেজনায় কপাল থেকে ঘাম ঝরছে বুক পিঠ ভাসিয়ে। দুই গম্বুজের কোণা এবং বড় গম্বুজের মাথায় হাতে হাতে ঘুরছে বিশ তিরিশটা ছোট-বড় কলকে। নীচে বহুদূর থেকে মাইকের আওয়াজ আসছে। কি-ই-যে ওরা চীৎকার করছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এতক্ষণেও পুলিশ কোনও বাধা দেয়নি। নীচে রামদিওয়ারের গেটে দেখা গেল বেতের ঢাল আড়াল করে সি.আর.পি কাদের যেন বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকশ মানুষের গুঁতোয় ভেঙে পড়ল পাঁচিল। রামকথা কুঞ্জের পশ্চিমের পাঁচিল টপকে এবং কাঁটাতার ঘেরা রামদিওয়ার টপকে মসজিদের দিকে ছুটে আসছে হাজার হাজার মানুষ। তাদের একটা

বড় অংশ গিয়ে যোগ দিচ্ছে নীচের বাহিনীর সঙ্গে। কিছু কিছু ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। ধাক্কা ধাক্কিতে গম্বুজের পিছন গা বেয়ে কেউ কেউ গড়িয়ে পড়ছে নীচে। তারই মধ্যে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে একের পর এক শাবল বসছে চাবি-পাথরের চারপাশ ঘিরে বৃত্তাকারে। প্রথম গম্বুজের মাথায় চাবি-পাথরকে ঘিরে ৪৫° এ্যঙ্গেলে গেঁথে গেল মোট আটটি শাবল।

আওয়াজ উঠল রশি লাওজি ...... কয়েকশ মানুষ নাইলনের কাছি হাতে ছুটে এল গম্বুজের দিকে। দড়ির কুন্ডলি বাতাসে ভেসে পাক খুলতে খুলতে আছড়ে পড়ল গম্বুজের মাথায়। মাত্র তিন-চার মিনিটেই শাবলের নির্দিষ্ট স্থানে খাঁজকাটা (আগে থেকেই তৈরী গ্রিপ বা গ্রুভ হোল) অংশে বাঁধা হয়ে গেল স্কাউট নট (সম্ভবত ক্রোবিজ নট)। ততক্ষণে নীচের লোকজন দড়ির শেষপ্রান্ত টান টান করে বেঁধে দিয়েছে মাটিতে পোঁতা খুঁটোয়। আওয়াজ উঠল হর হর। উত্তর এল ব্যোম-ব্যোম। প্রথম গম্বুজ খালি করে দিয়ে জঙ্গিরা একে একে উঠে এল বড় গম্বুজের মাথায় এবং ঢালে। হাড়ুডি বাহিনী চিত হয়ে শুয়ে পড়ল খানিক বিশ্রাম নিতে। স্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত। আবার আওয়াজ উঠল তিন-চার পাঁচ-ছয় ভারত মাতাকি জয়। দূরে তখন লাইন দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে আর.এস.এস এর শেষতম স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন সিনিয়র দাদা। শুরু হল দড়ির টান। নীচ থেকে একতরফা টাগ অব ওয়ার; আকাশ ফাটিয়ে - আওয়াজ উঠল – গিরা দো ধাঁচা -- হর হর - শংকর। বেলা একটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। একসঙ্গে মড-মড-ঘর-ঘর-ঘর আওয়াজ তুলে গম্বুজ ছেড়ে বাতাসে কয়েকফুট ওপরে লাফ মেরে উঠল প্রথম গম্বুজের কি স্টোন। শত শত মানুষের বিজয় হুংকার। অজস্র ধারায় লাল ধূলো। মুহূর্তে হুড় মুড় করে ধ্বসে পড়ল গম্বুজ সমেত গোলাকার দেওয়ালে দুই-তৃতীয়াংশ। দ্বিতীয় গম্বুজের মাথায় তখন রুদ্রের তান্ডব।. কয়েক হাজার মানুষ পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে শাবল গাঁইতির গুঁতোয় ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে অবশিষ্ট দেওয়াল। হাতে হাতে ইট নিয়ে ছুটল

বাহিরে। সামনে তখন অনেকটাই ফাঁকা দৃষ্টিপথ। সীতা রসুই ভবনের মাথায় কারা যেন হাত পা নেড়ে চীৎকার করে কি-সব বলছে। মনে হল জঙ্গিদেরকে তারা প্রবল উৎসাহ দিচ্ছে।

দ্বিতীয় গম্বুজের ওপরে শুরু হল প্রাস্টার ছাড়িয়ে শাবল পোঁতার কাজ। কারা যেন বেধড়ক পেটাচ্ছে একজনকে। — মার দো শালিকে। — নীচে গিরা দো। — প্রেসবালা ইধার ক্যায়সে আয়া ? তুমলোগ দিখা কিঁউ নেই। — লাগতা শালি মুসলমানি হো। — ক্যা দাদাজি খতম কর দুঁ ? — যো করনা হ্যায় নীচে উতারকে করো। মন্দিরকে উপর নেহি। ইয়ে রামজিকে জনমস্থান হ্যায়। একদল যুবক গলা টিপে, ঘাড় মুচড়ে ধরে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নীচে নিয়ে গেল এক কিশোরীকে। (ইনিই বিজনেস ইন্ডিয়ার রুচিরা গুপ্তা)। গম্বুজের মাথার ওপর ঠং ঠং শব্দে শাবলের মাথায় পড়ছে দশ-বিশ পাউন্ডের হাতুড়ি। নীচ থেকে আওয়াজ আসছে — জয় শ্রীরাম।

— অপারেশন সাকসেসফুল।

— ইঞ্জিনিয়ারসাব আপলোগ চলতে হেঁ।

— জি হাঁ। ম্যাপ ঔর অপারেশন সার্কেল বনা দিয়া। তুমহারা কাপ্তান হ্যায়। আগে বাড়তে রহো। জয় শ্রীরাম।

— জয় শ্রীরাম। হর হর শংকর - জয় মা ভবানি।

— মার গুড দিয়ে রুটি। বাবলু খেল জমে গেছে বে। এবার শালা আলিমুদ্দিনের গুষ্টি বেচব। .....দুই বঙ্গ নন্দনের তুমুল হর্ষধ্বনি - দাপিয়ে শ্লোগান উঠল — রুদ্র দেবতা - জয় জয় কালি। হর-হর-ব্যোম -ব্যোম। ......শেষ গম্বুজটা ভেঙ্গে পড়েছিল বিকেল চারটের কিছু আগেই ...... ।

রামায়ণের পিঠে বিজেপি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধ ধ্বংসের কারণে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার কোমায় আচ্ছন্ন যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শরীর, ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাস জুড়ে শয্যাশায়ী ছিল, তার কিছু লিখিত চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো মাত্র।

।এক।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও তার খতিয়ান

১লা ডিসেম্বর : প্রতীকি করসেবার স্থলে অর্থাৎ বিতর্কিত রাম-জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ এলাকায় সুপ্রীম কোর্টের যে আদেশ বলবৎ আছে তা লঙ্ঘিত হবে না এই আশ্বাস পি.ভি. নরসিংহ রাও দিয়ে থাকলেও; মুরলীমনোহর যোশী ও এল কে আদবানি এইদিন দিল্লি থেকে সদস্যদের প্রবল হর্ষধ্বনির মাঝে অযোধ্যা যাত্রার প্রাক্কালে তাঁরা কখনই এমন আশ্বাস দিতে পারলেন না যে, বজরং দল বা ভারতীয় হিন্দু পরিষদের করসেবকরা আক্রমণ থেকে বিরত

থাকবে। পাশাপাশি একই দিনে বিতর্কিত সৌধ ভাঙা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল বাবরি মসজিদ সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দল তথা জ্যোতিবসু সরকারি ব্যবস্থায় খুশি নন বলে বিধানসভায় মন্তব্য করেন। এছাড়া ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ ও উত্তরপ্রদেশ সরকারকে ভেঙ্গে ফেলার প্রস্তাব রাখেন। বামপন্থী দলগুলো কংগ্রেসকে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবে বলেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

২রা ডিসেম্বর : ফৈজাবাদে লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন। লরি লরি করে চাল, ডাল, আলু পাঠানো হচ্ছিল। কলকাতা থেকেও গেছে। যেহেতু করসেবদের মন্দির তৈরী নির্মাণের ব্যাপারে আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে তাই। বিজেপির বাজপেয়ি সহ অন্যান্য সাধুসন্ত অর্থাৎ আর.এস.এস. ও বি.এইচ.পির নেতৃত্ব মিলে আইন বাঁচিয়ে তাদের নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

৩রা ডিসেম্বর : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস বি চবনের অনুমোদনে উত্তরপ্রদেশে কেন্দ্রীয় সেনা বাহিনী পাঠানো হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ছাড়াই ফৈজাবাদে সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

অন্যদিকে অযোধ্যায় যে সমস্ত কংগ্রেস নেতা শান্তি মিছিলের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা করেন তাদের

গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় ১৫০০ কংগ্রেস কর্মীকেও একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পরে তাদের অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে জনতা দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা ভি পি সিংকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেন, শান্তি মিছিল শুরু করে দিয়ে। তবে অযোধ্যায় নরসিংহের অনুরোধে অর্জুন সিং, পাইলট পরিদর্শন থেকে বিরত থাকেন।

৪ঠা ডিসেম্বর : ২.৭৭ একর জমিতে প্রস্তাবিত করসেবার প্রকৃতি কি হবে তা নিয়ে মন্দির সংস্কার কমিটির বৈঠক বসে। তাতে সাধুরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মূলত এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ১১ই ডিসেম্বর ঘোষিত হবে। এই সময় কাল পর্যন্ত তারা প্রতীকি করসেবা করবেন, এই চরম ঘোষণা অনুসারে তারা করসেবকদের ১১ই ডিসেম্বর অবধি অযোধ্যায় থেকে যাবার নির্দেশ দেন।

এদিকে কর সেবার নামে বিজেপির সাম্প্রদায়িক উস্কানির প্রতিবাদে, বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দল তাদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, অনশন, ধারণা সংঘটিত করতে থাকে। এইদিন কেরলের ইসলামিক সেবক সংঘ ৬ই ডিসেম্বর 'কালা দিবস' পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জনতা দলের সভাপতি অজিত সিং, সমাজবাদী জনতা দলের নেতা মুলায়ম সিং যাদব সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মন্দির ইস্যুতে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নরসিংহ। অপরদিকে কলকাতার শহিদ মিনারে বামফ্রন্ট সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমাবেশ ডাকে। জ্যোতিবসু জনসভায় বলেন সাধু সন্তরাই কি দেশ

চালাবে ? বসু আরও বলেন, কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল না হলেও, এই দলের কিছু মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। অবশ্য কেরালায় অতীতে মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একদা যে বামপন্থীরা ত্রুটি করেছিলেন, সেই কথা অকপটে বসু স্বীকার করেন।

৫ই ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সাধুসন্তদের মার্গ দর্শক মন্ডলের বৈঠকে আলোচনা সাপেক্ষে স্থির হয়, রামজন্মভূমির সীমানা থেকে তারা সমস্ত সদস্যদের দু কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এবং আগামী ৬ই ডিসেম্বর তারা রামলীলা ময়দানে সমস্ত করসেবকদের সরিয়ে এনে, সেখান থেকে 'এক হাজার' করে এক একটি দলের ব্যাচ তৈরী করে, ঐ সেবকদের হাতে, চাদরে, ব্যাগে সরযূর নদীর বালি দিয়ে পাঠাবেন করসেবাস্থলে। ঐবালির সাহাযোই কংক্রিট প্ল্যাটফর্মের আশেপাশের গর্ত ভরাট করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ে যাতে দুহাজারের বেশি করসেবক না থাকে তা লক্ষ্য রাখা হবে। অর্থাৎ করসেবক ও সুপ্রীম কোর্টের সেতুবন্ধনে বিজেপি তাঁদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখতে চাইছিল। কেরলসহ রাজ্যে রাজ্যে সতর্কবার্তা জারি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক কল্যান সিংকে চিঠি। চবন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংকে চিঠিতে জানান আপনি অবিলম্বে করসেবা স্থলে নিজে পরিদর্শন করুন। গলদ থাকলে ব্যবস্থা নিন।

৬ই ডিসেম্বর : রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কিত সৌধ আক্রমণ করে তাকে ধ্বংস করে উন্মত্ত করসেবকেরা। এইদিন লজ্জিত ও ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং পদত্যাগ করেন।

ঐ রাজ্যে অতএব বলবৎ হয় রাষ্ট্রপতির শাসনজারি। উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে সমস্ত উত্তরপ্রদেশে। লক্ষ্ণৌতে ও আরো পাঁচটি শহরে কার্ফু জারি করা হয়। ঐদিন গভীর রাত পর্যন্ত যে ধ্বংসলীলা চলে তাকে বাধাদানে অক্ষম হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ঘটনার জেরে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস দল ভিন্নভাবে ২৪ ঘন্টার বনধ্ ডাকে ৮ই ডিসেম্বরে। বি জে পি ও আর এস এস এই ঘটনা দুঃখজনক বলে বর্ণনা করে। তবে বিশ্ব হিন্দুপরিষদ বা শিবসেনা অনুতপ্ত হবার বদলে ছিল গর্বিত। সুপ্রিম কোর্ট থেকে নিযুক্ত পর্যবেক্ষক তেজশঙ্করকে, মোরদাবাদ জেলা জজ কর্মস্থলে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ পর্যবেক্ষণ করার মত অযোধ্যায় কোন বস্তুই অবশিষ্ট নেই।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির ভাঙচুর ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়। লুঠতরাজও সংঘটিত হয়েছে অবলীলা ক্রমে। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন রাজ্যে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে।

পাশাপাশি বাংলাদেশের 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' হরতালের ডাক দেয় ৮ই ডিসেম্বর, এবং একই সঙ্গে মানব বন্ধন কর্মসূচীর ডাক দিয়েছে।

৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৮ই ডিসেম্বর : উন্মত্ত করসেবকদের বিতাড়িত করার কৌশলস্বরূপ রাজ্যপাল খাদ্য পানীয় জলের মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের বন্ধের ব্যবস্থা নিলেন। পদস্থ

অফিসারদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা হয়। করসেবকদের বিশাল অংশ ঘরে ফিরতে চাইলে তাদের জন্য বিশেষ বাড়তি ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব চার্চের পক্ষ থেকে সংখ্যা লঘুদের ওপর আক্রমণের নিন্দা গ্রহণ করে বলা হয়, এটি অশুভ লক্ষণ। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বুশ প্রশাসনও। তাদের পক্ষ থেকে এক আবেদনে বলা হয়েছে, অবিলম্বে সমগ্র রাজনৈতিক দলের এক্ষেত্রে নরসিংহ রাওকে সাহায্য করা উচিত।

অযোধ্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষীতে শ্রীলঙ্কার কলম্বোসহ সমস্ত শহরে পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে, বিশেষত তামিল প্রধান অঞ্চলের প্রতি জোরদার নিরাপত্তা রাখতে আদেশ জারি হয়। মন্দিরগুলো রক্ষণাবেক্ষণে নেওয়া হয় কঠোরতম ব্যবস্থা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এক তারবার্তায় ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় তাঁদের সুরক্ষায় গ্যারান্টি চেয়ে পাঠান। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত ও বাংলাদেশের একদিনের সার্ক ক্রিকেট ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। ভারতের দূতাবাস আক্রান্ত হবার পাশাপাশি স্টেডিয়ামে হাঙ্গামা হয়। দুবাই, ইরাক, ইরান সহ মধ্যপ্রাচ্য দেশের ইসলামিক জোট প্রতিবাদী তারবার্তা পাঠিয়ে নিরাপত্তা দাবি করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বিহারের দুই কংগ্রেস(ই) নেতা, প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করে তীব্র নিন্দায় প্রতিবাদী হয়ে পদত্যাগ করেন। অনুরূপভাবে সমস্ত নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে, বিরোধী বিজেপি নেতার পদে আডবানী ইস্তফা

দেন। অন্যদিকে বামমোর্চা, বাবরি মসজিদ সংগ্রাম কমিটির ডাকে ২৪ ঘন্টার বনধ ডাকার ফলে পশ্চিমবঙ্গে ৪৮ ঘন্টার বনধ জারি থাকল। কলকাতায় ডাকা হল কার্ফু। সেনা টহল শুরু হল। এইরকম এক ভয়ংকর মুহূর্তে রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক "পাঁচদফা অ্যাকশন প্ল্যান" ঘোষণা করে।

এক – সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করা হবে।

দুই – রাও কর্তৃক ঘোষিত হয় ভেঙ্গে ফেলা বিতর্কিত সৌধ নবনির্মাণ হবে।

তিন – রামমন্দির তৈরীর জন্য অযোধ্যায় উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে ১১ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের পরে।

চার – বিতর্কিত সৌধ ধূলিসাৎ করার ব্যাপারে ও প্ররোচনাকারী ব্যক্তিসহ সমস্ত অপরাধীদের সনাক্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

পাঁচ – যেখানে যেমন 'কর্তৃপক্ষের' অবহেলার গাফিলতি খতিয়ে দেখে আদালতে অভিযোগ আনা হবে।

দুদিনে যা সম্ভব হয়নি মাত্র ৪৫ মিনিটে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ও সি আর পি এফ 'অপারেশন ফ্লাশ আউট' চালিয়ে বাদবাকি ৩০ হাজার করসেবকদের রামজন্মভূমি পরিসর ও রামকথা পার্ক থেকে দখল মুক্ত করে। অন্যদিকে বামদল, কংগ্রেসের ডাকা বন্ধের বিরোধিতা করে বিজেপিও ভারত বনধ ডাকে তবে তা ব্যর্থ হয়। প্রচন্ড চাপের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপির নেতা আডবানী ও যোশীকে গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে পরিষদের তিনপ্রধান - অশোক সিংঘল, বিষ্ণুহরি ডালমিয়া এবং গিরিরাজ কিশোর ধরা পড়েন। গ্রেপ্তার

হন সাধ্বী ঋতম্ভরা ও উমা ভারতীও। একই সঙ্গে পাকড়াও করা হয়েছে বজরং দলের প্রধান বিনয় কাটিয়ারকে।

অন্যদিকে বিবিসির প্রচারিত খবর ও দূরদর্শনে হিন্দু এবং মুসলমানদের মন্দির মসজিদ ভাঙার দৃশ্য দেখানোর মধ্য দিয়ে চলেছে উস্কানি। ভারত সরকার তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। পাক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জামা মসজিদের ইমাম সাক্ষাৎ করলে এক ভিন্ন মাত্রা পায়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় যে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিবার বর্গদের জন্য ত্রাণ হিসেবে ১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং যথাশীঘ্র পৌঁছে দেবার জন্য উদ্যোগও নিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে নতুন করে যাতে করসেবকেরা প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে সি আর পি কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে শ্রীম পরিসর ঘিরে ফেলে। অন্যদিকে সারা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার যে কালো মেঘ ঘিরে আছে তাকে কাটাতে নরসিংহ রাও বিজেপি ও সাম্প্রদায়িক দল বাদে অন্যান্য ধর্ম নিরপেক্ষ দলের সঙ্গে একত্রে শান্তি কমিটি গঠন করতে রাজ্যে রাজ্যে নির্দেশ দিলেন। এই প্রসঙ্গে বি জে পির প্রথম সারির নেতা সুন্দর সিং ভান্ডারি এবং কে আর মালকানির মতামত, "বিজেপির নেতাদের গ্রেপ্তার করে যেমন নরসিংহ ভুল করলেন, তেমনি মসজিদ গঠনের সিদ্ধান্তে কংগ্রেস বড় বাধা পাবে। এর প্রতিক্রিয়ায় বি জে পি পার্টিগতভাবে লাভবান হল বেশি।"

যে সাম্প্রদায়িকতার রোষে অযোধ্যায় বিতর্কিত সৌধ ধূলিসাৎ হলো তার জেরে কেন্দ্রীয় সরকার বে আইনী কার্যকলাপ নিরোধক আইনে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল এছাড়া জামাত-ই-ইসলামি এবং ইসলামিক সেবকসংঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, রাজ্যে রাজ্যে এর কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে নির্দেশ দিলেন।

বিজেপির স্বীকৃতি বাতিল হবে কিনা তা ছিল বিচার সাপেক্ষ। অবশ্য বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়, কংগ্রেস হাইকমান্ডের দয়ায় স্বীকৃতি পাইনি।

১৮ই ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর : অন্য এক পটভূমিকায় পাকিস্তান, ওমান, ইরান, সৌদি আরব বাংলাদেশ ও কুয়েতের রাষ্ট্রদূতেরা চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা করে অযোধ্যার পরিণাম নিয়ে আলোচনা করেন।

অযোধ্যার বিতর্ক নিয়ে ঘোলাজলে যখন ভারতের রাজনীতি, সমাজজীবন বিপর্যস্ত তখন ধারাবাহিকভাবে লন্ডনের মন্দিরগুলো ইসলামিক হানায় হামলা চলে। এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতের হাইকমিশনার ডঃ এল এম সিংভি ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান।

১৯৯১ সালে ৭ ও ১০ই অক্টোবর তৎকালীন বিজেপি সরকার অযোধ্যার বিতর্কিত ধর্মস্থানের লাগোয়া যে জমি (২.৭৭ একর জমি) অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাকে ঘিরে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে বিচার চলছিল, এলাহাবাদ হাইকোর্ট তা খারিজ করে দিল। পাঁচ সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে বিজেপি পালন করল সারা ভারত বর্ষ ব্যাপী কালাদিবস। অন্য একভাবে নিষিদ্ধ, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সদস্যদের আত্মগোপনের নির্দেশ দিলেন। বামেরা হুমকি দিলেন পি.ভি. পূর্বেই বামদের পরামর্শমত কাজ না করায় এই অঘটন ঘটল। বর্তমানে তিনি যদি আন্তরিকভাবে বিজেপির মোকাবিলা না করেন তবে বামেরা তার পদত্যাগের দাবীতে সোচ্চার হবে। পাশাপাশি বিজেপি কিছুটা নরম সুরে বলে পরিসরের বাইরে মসজিদ হলে তাদের আপত্তি থাকবে না। এরই মধ্যে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অর্জুন সিং

ও শরদ পাওয়ার হিমাচল, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ভাঙতে নরসিং কে চাপ দিতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, অনতি বিলম্বেই অর্থাৎ ১৫ই ডিসেম্বর বিজেপির সরকার ভেঙ্গে দেয়া হলো ঐ তিনরাজ্যে, রাষ্ট্রপতির শাসন জারির মধ্য দিয়ে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বিজেপি দল রাষ্ট্রপতি শঙ্করদয়াল শর্মার কাছে গিয়ে অন্তবর্তী নির্বাচনের দাবী জানায়।

কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল আপাতত তারা মসজিদ মন্দির তৈরীর প্রশ্নে মৌন ব্রত পালন করবে। ভেতরকার সংসদের রাজ্য ও লোকসভার দৃশ্য তখন হৈ হট্টগোলে ভরা। আদবানী-যোশীকে সংসদে ফিরিয়ে আনার দাবীতে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সংসদের কাজ পন্ড করে দেয়। তবে তাদের বিশৃঙ্খলার মধ্যেও অযোধ্যাকান্ডের নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পরের পট পরিবর্তন অতি দ্রুত। সংসদে বিজেপির আনা অনাস্থা প্রস্তাবে, বাম দল কংগ্রেসকে সমর্থন জানানোয় এ যাত্রা টিকে গেল কংগ্রেস সরকার। সংঘর্ষ ছেড়ে বিজেপি নিলো নরম লাইন। তবে বিজেপি কে সভা সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই আদেশ জারির প্রতিবাদে অটল বিহারী বাজপেয়ী অনশন শুরু করেন। পরে আর এস এসের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই, এই আশ্বাস বাক্যের পরে, চবনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে বাজপেয়ী অনশন তুলে নেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একত্রে লড়ার জন্য বামদের সঙ্গে নিতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী দলীয় সদস্যদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মমতা পন্থীদের একগুয়েমির জন্যে পঃবঙ্গ ও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বামদের সঙ্গে একমঞ্চে কংগ্রেস না থাকলেও প্রধানমন্ত্রী হুইপ জারি করবেন না বলে জানান। পরিশেষে অযোধ্যায় বিতর্কিত এলাকাসহ প্রায় ৫০ একর জমিতে কেন্দ্রীয় সরকার মন্দির ও মসজিদ দুটি ট্রাষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে মন্দির-মসজিদ গড়বে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

দুই

অযোধ্যা কান্ডের বিশেষত্ব

অযোধ্যাতে একটি পূর্বমূখী রাম মন্দির ছিল। মোগল আমলে তার মাথাটি ভেঙে সেখানে মসজিদের গম্বুজ সাঁটানো হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে মন্দিরওয়ালা ও মসজিদওয়ালা উভয়েই নেটিভ হয়ে পড়ায় মসজিদওয়ালাদের গুরুত্ব কমে যায়। ক্রমে ব্রিটিশ শাসন শিথিল হয়ে পড়ায় তাদের বিরোধ বাধে। ততক্ষণে সামাজিক বিধানদাতা রূপে আধুনিক পুরোহিত 'কোর্ট' এসে গেছে প্রেক্ষাপটে এবং রাজপুরোহিতের আসনে বসে গেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিরোধ যায় কোর্টে আজ থেকে ১০১ বছর আগে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ছিল কেউ যেন ঐ মন্দির-কাম-মসজিদ ভেঙ্গে না ফেলে। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখে কিছু লোক ঐ সৌধটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধুলিসাৎ করেছে। ফলতঃ ঐ দিন অযোধ্যাতে সুপ্রীম কোর্ট, মসজিদ ও মন্দির তিনটিই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

এই ধ্বংস কান্ড মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং সরকারি ভাবে রুখতে না পারার দায়িত্বস্বীকার করে ইস্তফা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ঐকান্ড রুখতে না পারার দায় এখনও স্বীকার করেন নি। রাজপুরোহিতের সম্মান রক্ষা করা রাজার কর্তব্য হলেও রাষ্ট্রপতি সক্রিয় হয়েছেন সুপ্রীম কোর্টের সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার পর। মাত্র ৪৫ মিনিটে তাঁর সেনাবাহিনী বিতর্কিত চত্বর সাফ করে দিয়েছে।

কারা এই কান্ড ঘটালো ? - এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলেই বলেছেন যারা ঐ কাড করেছে তাদের নেতা বিজেপি। বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্ট থেকে, বিশেষত ২০.১২.৫২ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার বিস্তৃত রিপোর্ট থেকে জানা যায় বিজেপির নেতারা ঐ দিন প্রাণপণ চেষ্টা করেও ঐ ধ্বংস কান্ড রুখতে পারেন নি। তারপর একবার ভাঙা

শুরু হয়ে যাওয়ার পর তাদের নিচু তলার নেতারা ঐ কাজে সহযোগিতা করেছেন। তাই বিজেপি বক্তব্য তাঁরা ঐ ধ্বংস কান্ড করেন নি, করেছে "হিন্দু ভাবাবেগ"।

ময়না তদন্ত

উপরোক্ত ঘটনাবলী এক সার প্রশ্নের জন্ম দেয়। ওটা যে মন্দির-কাম-মসজিদ একথা সবাই গোপন করতে চায় কেন? বিচার ব্যবস্থা কেন ১০১ বছরেও ঐ বিতর্কের অবসান করতে পারল না? সে কি বিচার করবার অযোগ্য বলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করে ফেলেছে? বিচার ব্যবস্থার এই অযোগ্যতাকে জনগণ স্বীকৃতি দিক-এটাই কি রাষ্ট্রপতির কাম্য ছিল? আগের দিন তাঁর সেনাবাহিনী ৬ ঘন্টাতেও কিছু করতে পারল না কেন, যারা পরের দিন ৪৫ মিনিটে বিনা রক্তপাতে চত্বর সাফ করতে পারে? নেতাদের অমান্য করে 'হিন্দু ভাবাবেগ' যেমন চাইছিল 'একটা হেস্তনেস্ত' করতে, রাষ্ট্রপতিও কি চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি স্বরূপ মন্দির-মসজিদ ও তাঁদের বিরোধের রক্ষাকর্তা সুপ্রীম কোর্ট আমূল ধ্বংস হয়ে যাক?

আরও প্রশ্ন আসে। বিজেপি কি আসলে কংগ্রেস সি পি এমের মতই হিন্দু বিরোধী? তা নইলে অযোধ্যা কান্ডের কৃতিত্ব দাবী না করে সে 'হিন্দু ভাবাবেগের' ঘাড়ে ঐ দায় চাপায় কেন? 'হিন্দু ভাবাবেগ' আর বিজেপির ভাবাবেগ কি আলাদা? তাছাড়া বিজেপিই কি এতকাল সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দু ভাবাবেগ জাগায় নি? জাগিয়ে থাকলে তাকে চরিতার্থ হতে না দিয়ে তার সঙ্গে বেইমানি করে কেন? বি জে পি কি কেবল ভোটের জন্যই হিন্দু ভাবাবেগ জাগায়? তার নিজের ভাবাবেগ কি তবে ভোট পর্যন্তই? আরও আছে। জাগ্রত হিন্দু ভাবাবেগ কি বিচার ব্যবস্থার উপর 'ফেড্-আপ' হয়ে যায় নি? নাকি বিচার-ব্যবস্থা, মসজিদ, মন্দির ধ্বংস করার মধ্যেই হিন্দু ভাবাবেগ আপন চরিতার্থতা খোঁজে?

রামচন্দ্র পুরোহিত শ্রেষ্ঠ শিবপূজারী রাবণকে শত্রুরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ রামচন্দ্র দেখেছিলেন যারা শিবমন্দির বানিয়ে শিবপূজা করে তারা ভন্ড। তারা শিবের নীতি মানে না, আসলে তারা শিবনীতি গোপন করে তা ধ্বংস করে। শিবের নীতি ছিল কোন সামাজিক কর্ম থেকে জাত জ্ঞান বা কোন উদ্বৃত্ত তৃণকেও যে ব্যক্তিগত বলে দাবী করে তাকে সংহার করা উচিত (দ্রষ্টব্য-শিবপুরান)। কিন্তু ঐ ভন্ড শিবপূজারীরা উন্নয়ণের দ্বারা স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধে দেওয়ার অঙ্গীকার বদ্ধ হয়ে ছিল পুরোহিত, তারা উন্নয়ণের মহারবকারী রাবণের নেতৃত্বে পরিচালিত। ট্যাক্স/চাঁদা আত্মসাতের মাধ্যমে তাদের হাতে শিব মন্দিরগুলি সোনারূপা মজুতের দূর্গ ও সুদ ব্যবসার পীঠস্থান স্বরূপ আদি ব্যাঙ্ক হয়ে ওঠে। রামচন্দ্র ধরে ফেলেন, শিবের চরম শত্রু দক্ষরাই ভন্ড শিবপূজারী সেজে যক্ষ রক্ষে পরিণত হয়েছে। সেকালে 'পুরোহিত হত্যা মহাপাপ' ছিল আইন বা সংবিধান এবং এই হরের নীতি বলে পুরোহিতরাই রটিয়েছিল। সে হরধনু ভঙ্গ করে রামচন্দ্র যক্ষ (সুদখোর) ও রক্ষ (আইনের শাসন রক্ষক বা ধর্ম রক্ষক) দের হত্যা করেন এবং রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন যা আজও ভারতবাসী ভুলতে পারেনি। বলা ভাল, ঐ হরধনুভঙ্গ থেকেই আইন অমান্য আন্দোলন জন্ম লাভ করে।

কিন্তু ঐ রাম রাজত্ব চিরস্থায়ী হয় নাই। বণিকরাজ জনকের জামাতা ও ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র যক্ষরক্ষের জন্মদাতা দক্ষের গায়ে হাত দিতে পারেন নি। তাই তাঁকে যেমন একদিন সরযূতে আত্মবিসর্জন দিতে হল, তেমনি একদিন দক্ষদের প্রচেষ্টায় যক্ষরক্ষ পুরোহিতেরা পুণরায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হল এবং রাম নীতি ধ্বংস করার জন্য নিজেরাই যথারীতি রামপূজারী সেজে বসল। এবার তাদের হাতে শিবমন্দির সহ রামমন্দিরগুলিও সোনারূপা মজুতের দূর্গ ও সুদব্যবসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। ভন্ড শিবপূজারীরা যেমন প্রকৃত শিবভক্তদের অস্পৃশ্য বলে

মন্দির থেকে দূরে রাখত, ভন্ড রামপূজারীরও রাম (ইত্যাদি) পদবী ধারী রামসেনা ও তাঁদের বংশধরদের অস্পৃশ্য ঘোষণা করে, অন্তেবাসী করে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি রচনা করেন। এইভাবে সারা দেশ জুড়ে যারা দক্ষ-যক্ষ-রক্ষ পুরোহিতদের নিকট পরাজিত হয়ে তাদেরই নেতৃত্ব পরিচালিত হতে বাধ্য হলেন এবং জ্ঞানকর্মযোগহীন দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য হলেন, সেই এককালের প্রকৃত শিবভক্ত রামভক্ত যোগীরা এবার হিন্দু নামে পরিচিত হলেন।

এক সময় বণিক মহম্মদ সুদখোরের চরম শত্রু হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুদের আশা হল, পুরোহিতদের হাত থেকে মুসলমানরা তাঁদের বাঁচাবে। কিন্তু সুদখোর ও তার স্বার্থরক্ষাকারীরা মহম্মদ অনুগামী সেজে ইসলামের সুদখোর-ধ্বংস-নীতিটিকেই বিনাস করল এবং ভন্ড মুসলমানে পরিণত হল। ভন্ড হলেই তার আর গাছের তলায় বসে ধ্যান বা তপস্যা করে কিংবা মাঠে গামছা পেতে নামাজ পড়ে লাভ হয় না। তার চাই ইমারত, মন্দির, মসজিদ, এককথায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম। ঐ ভন্ড মুসলমানরাই ভন্ড শিবপূজারী রামপূজারী পুরোহিতের নিশ্চিন্ত শাসনব্যবস্থা। ফলতঃ ঐ ভন্ড মুসলমানেরা পুরোহিত পরিচালিত দুঃস্পনে পর্যাবসিত হল ও হিন্দুদের শাসন করতে লাগল।

যে হিন্দুরা চাপে তাপে লোভে পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন, তাঁরা প্রতারিত হয়ে, নামে ভারতীয় মুসলমান, বস্তুত হীনদোষে হিন্দুই থেকে গেলেন। সুদখোরদের পদানত মুসলমান কখনই প্রকৃত মুসলমান নয়।

একসময় কেরানী ক্লাইভের নেতৃত্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উমিচাঁদ জগৎ শেঠ প্রভৃতি সুদখোরদের রক্ষক 'ভন্ড মুসলমান' শাসকদের কর্তৃত্ব বিনাশ করে কোম্পানীর বিচার-ব্যবস্থা সৃষ্টি করল। হিন্দুদের আশা হল, কোম্পানী নিশ্চয় সুদখোর/পুরোহিত বিনাস করে তাঁদের রক্ষা করবে। এইরূপ আশা ছিল বলেই তাঁরা যে ঢিল মেরে ক্লাইভদের

মেড়ে ফেলেনি, সেকথা ক্লাইভ বলে গেছেন। কিন্তু ১৭৫৭ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত ক্রমাগত ১৭ বৎসর যুদ্ধ করে কোম্পানী নিজেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় সুদখোরের ঋণদাসে পরিণত হয়। এবার ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় সুদখোর সুপ্রিম কোর্টরূপে আবির্ভূত হয় এবং পুরোহিত ও মেকি মুসলমানদের রক্ষার জন্য ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তির যে পথ পুনরায় দেখিয়ে গেছেন, এবারের অযোধ্যাকান্ড সেই আইন অমান্য আন্দোলনেরই একটি নতুন অধ্যায় মাত্র। এই অধ্যায় রাম পূজারী ও গান্ধী পূজারীদের রাজনৈতিক খেলা শেষ করে দিয়েছে। যেমন একসময় কংগ্রেসী গান্ধী জানিয়েছিলেন - 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ করা হবে', 'গণ প্রতিনিধি প্রথা দূর্নীতির ভিত্তি', 'ঋণ করে দেশ গড়তে গেলে দেশবাসী তেত্রিশগুণ ঋণদাসে পরিণত হবে', 'আদালতের পাল্লায় পড়ে যত অসুখ', 'উকিলের মজুরী নাপিতের মজুরির সমান হওয়া উচিৎ', 'ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক নাই যারা বলে তারা জানে না ধর্ম কি', - ইত্যাদি। হিন্দুদের বিশ্বাস হল - অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে কংগ্রেস তাঁদের রক্ষা করবে। কিন্তু পুরোহিত-গণপ্রতিনিধি- টেকনোক্র্যাট-হাকিম-উকিল-বুদ্ধিজীবি ইত্যাদিরা অর্থাৎ গান্ধী কংগ্রেসের চরম শত্রুরাই নেহেরুর নেতৃত্বে গান্ধী পূজারী কংগ্রেস থেকে গান্ধী নীতিগুলিকে বিনাশ করে, মন্দির মসজিদ পূজা সংস্কৃতি রক্ষার দ্বারা সেই অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিক লুম্পেনের স্বর্গরাজ্য রক্ষা করে চলল।

যেমন কোথাও বা মার্ক্সবাদীরা ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ করার জন্য সর্বহারার এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুদের আশা হল ব্যক্তি মালিক-সুদখোরদের হাত থেকে মার্ক্সবাদীরা তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু ট্যাক্সজীবি ট্যাক্স আত্মসাৎকারী ধনপতি-ভূপতি ব্যক্তি মালিকানার জয়গানকারীরাই মাত্রপূজারী হয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব নীতি বিনাশ করে সেই উন্নয়নের মহারবকারী ভন্ড

মার্ক্সবাদীতে পরিণত হয়েছে এবং লুম্পেনদের দিয়ে সর্বহারাদের শাসন করতে লেগেছে। ফলতঃ প্রকৃত শিবভক্তরা রামভক্ত, হিন্দু, মুসলমান, কংগ্রেসী, মার্ক্স বাদী ইত্যাদি হয়েও প্রতারিতই থেকে গেলেন। এমতাবস্থায় তাদের মনে হতেই পারে যে ঈশ্বরের 'পথ ঢেকাছে মন্দির মসজিদে (বাউল গান) কিংবা মনে হতে পারে, 'মন্দির মসজিদ চাই না' (অরবিন্দ পোদ্দার)। এই সেই 'হিন্দু ভাবাবেগ' যার প্রতিফলন ঘটে গেছে সেদিনের ধ্বংসকান্ডে। সম্ভবতঃ এই বিধ্বংসী কান্ড রাষ্ট্রপতির কাম্য ছিল। তা নইলে তিনি রাজগুরু সুপ্রীম কোর্টের সম্মান ধূলিসাৎ হতে দিতেন না। ভারতের যে কোন প্রান্তে আধ-ঘন্টার মধ্যে তার সেনাবাহিনী পৌঁছে গিয়ে তুমুল কান্ড ঘটানোর ক্ষমতা রাখে একথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি। তাছাড়া সুপ্রীম কোর্টের অবমাননার দায়ে তিনি রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সবই বাতিল করতে পারতেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সেনাবাহিনীর হাতে সব তুলে দিতে পারতেন। পারবেন যে, সে কথা অন্ততঃ আদবানী জানতেন, তাঁর সে দিনের আচরণ সে সব সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে গেছে। তবু যে রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা করেছেন তার একমাত্র এই ব্যাখ্যাই বিশ্বাস করা সহজ যে তিনি চেয়েছিলেন ১০১ বছরেও বিচার না করতে পারার প্রামান্য অযোগ্যতা নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট নামক আধুনিক রাজগুরু শেষ হয়ে যাক, তার অযোগ্যতা জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হোক। 'হিন্দু ভাবাবেগের' সঙ্গে রাষ্ট্রপতির এই একাত্মতা বোধের সমর্থন মেলে প্রধানমন্ত্রীকে তার প্রকাশ্য পরামর্শে, যাতে বিরক্ত বোধ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই সকল লুম্পেনের স্বর্গরাজ্য রক্ষাকারীদের বর্তমান দাবী এই যে রাষ্ট্রপতিকেও ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে, কারণ সংবিধান নামক পুথিতে ঐরূপ লেখা আছে যে রাজাকে পুরোহিতের কথামতোই চলতে হবে। রাষ্ট্রপতি ঐরূপ আচরণ না করায় বর্ণচোরারা রাষ্ট্রপতি পদের সম্মান ধূলিসাৎ করতে উদ্যত হয়েছে।

উত্তরকান্ড ও Patch Work

১৯৫৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন - 'দরিদ্র জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা ব্যর্থ করার জন্য ঔপনিবেশিক আইন ব্যবস্থার চেহারাটা যদি আমরা টিকিয়ে রাখি, তাহলে সমস্ত কিছুর উপর ব্যাপক জনগণের বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আইন বিদ্যাধররা বিচার বিলম্বের কৌশল জানেন ঠিকই, তবে কিনা বিচার করবার অযোগ্য, এটা বুঝতে জনগণের আরও ১৭ বছর সময় লেগে গেল। উত্তরকান্ডে তাই শুরু হয়েছে প্যাচ ওয়ার্ক। এক পকেটমার ধরা পড়ে গেলে অন্য পকেটমাররা তাকে পেটাতে পেটাতে যেমন জনরোষ থেকে দূরে আনে, তেমনি সবাই মিলে বি জে পিকে দুষছে। চার রাজ্যে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের গদিচ্যুত করায় গণপ্রতিনিধি প্রথাটাই আত্মহত্যা করতে লেগেছে। এবার চেষ্টা চলছে বি জে পিকে প্রকৃত হিন্দু বলে চালানোর। বিজেপিও ৬ই ডিসেম্বর হিন্দু ভাবাবেগের সঙ্গে সরাসরি বেইমানি করার পর সহসা একটা গম্বুজ ভেঙে ফেলার চার ভোল পাল্টেছে। ভান করছে যেন সেই মসজিদ ভাঙতে চেয়েছিল। এভাবে সে প্রকৃত হিন্দু সাজতে চায়। যেন মসজিদ ভাঙব বললেই হিন্দু ভাবাবেগের অংশীদার হওয়া যায়। হিন্দু ভাবাবেগের জোয়ারে পাড়ি দিয়ে তারা ক্ষমতায় আসবে। আর তাই আশা করে একদিন ক্ষমতায় এলেই শিবপূজারী, রামপূজারী, মেকি হিন্দু, মেকি মুসলমান, গান্ধী পূজাবী, মার্কস পূজারী সেই একই সুদখোর সত্তা এবার বিজেপি সেজে প্রকৃত শিবভক্ত, প্রকৃত রামভক্ত, প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত গান্ধী কংগ্রেসী ও প্রকৃত মার্কসবাদীদের গণহত্যা করে আবার অন্ধকার যুগ শুরু করা, এককালে রামরাজত্ব ধ্বংসের মাধ্যমে তারা যে সূচনা করেছিল। তাই বর্ণচোরারা দলে দলে বিজেপি হয়ে যাবে। বিজেপিও বেশি বেশি হিন্দু সাজবে। আর সব তারা করবে, কত ভোল তারা পাল্টাবে বলে শেষ করা যাবে না। কেবল যেটি তারা কখনই

কেউ করবে না, তা হলো শিবনীতি গ্রহণ। শিবনীতিকে তারা মঙ্গলের সমতুল দেখে। সুতরাং শিবনীতি সামনে এলে সব PATCH WORK—ই শেষ হয়ে যাবে।

King – কর্তব্যম

রাষ্ট্রপতি বহুপূর্বেই সংবিধান অমান্য করে জানিয়েছেন যে ছাত্ররা ছাড়া বর্তমান ভারত পরিচালনার যোগ্যতা কারও নেই। অর্থাৎ জাতীয় সরকার সম্বলিত নতুন পরিস্থিতির জন্য দেশ পরিচালনার নীতি ও সংগঠন নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য অধ্যয়ণ-গবেষণা-প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি করবার যোগ্য কেবল তারাই যারা স্বভাবতই জ্ঞানকর্ম যোগী অর্থাৎ ছাত্র। এখন রাষ্ট্রপতি ছাত্রদের আত্মচেতনার জন্য অধ্যয়ণের প্রারম্ভিক বিষয়টি ঠিক করে দিলেন - তিনি দেখালেন পরাজিত হিন্দুরা ইতিহাস তুলে ধরবার জন্য বাবরি মসজিদ ভাঙাকে উপলক্ষ করে সংবিধান সহ রাজপুরোহিতের সম্মান, গণপ্রতিনিধি-প্রথা।, বাবরি মসজিদ, রামলালার বিগ্রহ সহ রামমন্দির সবকেই পদদলিত করেছে। সুতরাং শিবের নীতি ধ্বংসকারীদের প্রতারণামূলক পূজা সংস্কৃতি ও শিবমন্দির ছাড়া আর কিই বা পদদলিত হতে বাকি ? হিন্দুরা নিজ হাতে শিব মন্দির ভেঙ্গে ফেললে বিশ্ব ব্যাঙ্কসহ বর্তমান প্রতারণা ভিত্তিক সমগ্র সভ্যতার মৃত্যু ঘটবে। যেহেতু তারা 'শিব গড়তে বাদর' তৈরী করেছে, তাই শিবের নীতি-ধারণ ক্ষমতা ছাত্রদের হবে না মনে করে লুম্পেনরা আপাততঃ যোগনিদ্রায় মগ্ন। আর রাষ্ট্রপতির সাধনা হ'ল কেমন করে ছাত্রদের শিবে পরিণত করা যায়, শিব গড়তে শিবই গড়া হয়।

তিন

অযোধ্যাকাণ্ডের অংশীদারদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং সম্পাদকদের ভূমিকা কিছু কম নয়। এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সব্যসাচী বাগচী, তপন সিকদার, অনিন্দ্যগোপাল মিত্র, পরশ দত্ত এবং উৎপল চক্রবর্ত্তীর সাক্ষাৎকার প্রয়োজন হয়ে পড়ায়, তাঁদের কাছে যে প্রশ্নাবলী রাখা হয়েছিল বিশেষ প্রতিবেদনের পক্ষ থেকে, তার গভীর বিশ্লেষণাত্মক উত্তর নীচে দেওয়া হল।

- অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে একটি মন্দির ছিল এটা সত্যি তো ? কারণ মসজিদ পূর্ব মুখী এবং টিলার ওপর থাকে না, সুতরাং ওটা মন্দিরতো নিশ্চয় ?

সব্যসাচী বাগচী : অবশ্য। আমরা তো প্রথম থেকেই বলে আসছি ওটা মন্দির। তার যথেষ্ট ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান নির্ভর প্রমাণ আছে।

- মন্দির ভেঙে সেখানে একটি গম্বুজের চূড়াকৃতি তৈরী করা হয়েছিল। কারণ মুসলিম সম্রাটরা এদেশে যখন প্রবেশ করে, তখন তারা প্রথম প্রথম মন্দির ধূলিসাৎ করত। পরে মন্দির অবিকৃত রেখে চূড়াগুলো ভেঙ্গে গম্বুজ সাঁটানো হয়েছিল এটা ঠিক কি ?

বাগচী : তা তো অবশ্যই।

- তাহলে মন্দির ছিল ওখানে। মন্দিরের মাথায় গম্বুজ ছিল। তার ওপর সুপ্রিম কোর্টের আদেশ ছিল ?

বাগচী : না।

● তবে কি ছিলো ?

বাগচী : ওটা রামজন্মভূমি না বাবরি মসজিদ এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ছিল।

● আপনার কথা অনুসারেই, ৬ই ডিসেম্বর মন্দির, মসজিদের গম্বুজ, এবং বিচার ব্যবস্থা তিনটিই বিনষ্ট হলো কি না ?

বাগচী : তা তো হয়েছেই।

● এটা কারা করল ? আর এস এস না হিন্দু ভাবাবেগ ?

বাগচী : আমরা মনে করি এটা 'র' অথবা পাকিস্তানি যোগসাজস, কিংবা শিবসেনারদ্বারা সম্ভব হয়েছে। প্রথম ঐ 'ভীড়ে' পড়া দূরাভিসন্ধি ব্যক্তিদের দ্বারা সৌধ ভাঙাভাঙি শুরু হলে পরে করসেবকরা যোগ দেয়।

● যে সমস্ত আর এস এস করসেবক আপনার কথায় পরে অনুপ্রাণিত হয়ে সৌধ ভাঙার কাজে যোগ দেয়, তাদের কি হিন্দু ভাবাবেগ ছিলো না ?

বাগচী : নিশ্চয়ই। হিন্দুদের হিন্দু ভাবাবেগ থাকবেই। তবে বিজেপির সদস্য অনেক মুসলমানও ঐ সৌধ ভাঙার কাজে হাত লাগিয়েছিল। যেমন লর্ড ডালহৌসির নাম আমরা পাল্টে ফেলেছি কারণ ওটা পরাধীনতার কথা মনে করিয়ে দেয়। তেমনি পাঁচশো বছর আগেকার ঐ সৌধ বিদেশীদের নির্মিত। তাই ভারতীয় মুসলমানদের কাছে (যারা আমাদের সদস্য) ঐদিন জাতীয় চেতনা বড় ছিল।

● আর এস এস আর বিজেপি কি এক ?

বাগচী : কখনোই নয়।

- তবে কি হিন্দু ভাবাবেগ আর বিজেপি আলাদা ?

বাগচী : বিজেপি একটি রাজনৈতিক পার্টি এভাবে বিচার করলে চলে না।

- বিজেপি কি চায়নি সৌধ ভাঙা হোক ? তারা কি প্ররোচনা দেয়নি।

বাগচী : না। তবে এ নিয়ে কংগ্রেস সরকারের মুসলমান তোষণের নামে যে বাড়াবাড়ি তার বিরোধীতা করি।

সভাপতি তপন সিকদারের সাক্ষাৎকার।

- হিন্দুরাষ্ট্রের প্রবক্তা 'ডাক্তারজী'র বাণী সম্বলিত পুস্তিকায়, সহস্রবার হিন্দু ও হিন্দুত্ব কথার উল্লেখ থাকলেও হিন্দু ও হিন্দু ধর্ম কি বুঝতে পারলাম না। একটু ব্যাখ্যা করবেন।

সিকদার : হিন্দু, কোন ধর্ম নয়। 'বেদ' ভিত্তিক যে সংস্কৃতি, আচার আচরণ অর্থাৎ কালচার, যা মানুষকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শিখিয়ে তোলে অর্থাৎ সহানুভূতিশীল, সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং যে চেতনা মানবিক বোধকে উদ্বুদ্ধ করে তাই হিন্দুত্ব।

- 'বেদ'-এর কথা যখন উঠল, তখন বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র, বৈশ্যের জাতিগত বিভেদ স্বীকার করবেন কি ? উঁচু নীচু ভেদাভেদ মানবেন কি ?

সিকদার :

ভুল করছেন, ওটা জাতি ভেদাভেদ নয়। ওটা কর্মের ভেদাভেদ।

- কর্মের ভেদাভেদ গড়ে উঠল কিভাবে ? 'বিনিময়' ব্যবস্থা না থাকলে তো তা সম্ভব হয় না ?

সিকদার : সামাজিক ভাবেই গড়ে উঠেছিল। আপনার প্রশ্ন সঠিক নয়। ভুল প্রশ্ন করছেন ('ভুল প্রশ্ন করছেন' এই কথা বলাটা সিকদারের মুদ্রা দোষ। মনোমত না হলেই এটা বলেন)।

- 'বিনিময়' মানে তো ব্যবসা। ব্যবসা থাকলে শোষণ থাকে। শোষণ ব্যবস্থাই কর্মের ভেদাভেদ ঘটায় এটা বলবেন না।

সিকদার : কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তাদের স্বার্থ সিদ্ধিতে বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে এটা থাকছেই। তবে সমাজই সব ব্যবস্থা গড়ে। - তবে চতুর্বর্ণের ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত ছিল।

- নীতি না মেনে যারা পূজা করে, তারা 'ভন্ড' কিনা ?

সিকদার : অবশ্যই। মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় গেলেই ধর্ম হয় না। অনেকে মঠ, মসজিদ, গীর্জায় না গিয়েই সাধু মনোভাবাপন্ন এবং ধর্মীয় ভালো মানুষরূপে পরিগণিত হয়েছেন। ধর্ম ঘরে বসেও করা যায়। আবার অনেকে মন্দিরে, মসজিদে গিয়েও অসাধু। ধর্মের জন্য উপাসনাস্থলে যেতেই হবে, এই মানসিকতা অনেকটা কু-সংস্কারের মতন। কালীঘাটে ডাকাত যায়, গৃহস্থ যায়। কাজেই ওভাবে হয় না।

- তবে পুরানের কথা যখন উঠলই, তাহলে আপনি 'শিবপুরান' পড়েছেন নিশ্চয়ই ? তাতে শিব, পূজা পদ্ধতির বিরুদ্ধে।

শিবনীতি ছিল এককথায় বিনা আয়াসে যারা ফল ভোগ করবে তাদের সংহার করা উচিত। রামচন্দ্র, হজরত মহম্মদ, যীশু প্রত্যেকেই সুদখোরের বিরুদ্ধে লড়াকু নেতা। অর্থাৎ 'পরজীবির' বিপক্ষে। আপনারা কি এই নীতি মানেন ?

সিকদার : ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের পার্লামেন্টের সদস্যরা সব বোগাস। এরা যেমন দেশের বড় বড় পুঁজিপতি থেকে শুরু করে বিদেশের বড় পূঁজিতে আহবান করে, ভারী শিল্প থেকে নুনের ব্যবসা পর্যন্ত করার সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, তাতে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা মার খাচ্ছে। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এখানে কুটির শিল্পকে প্রাধান্য দিতে গেলে ঐ একই দ্রব্যের ভারী শিল্প বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানকার প্রতিনিধিরা টাকা খেয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে বিদেশী পূঁজিকে ডেকে আনে। তাতে কুটির শিল্পের অবস্থা করুণ হচ্ছে। যার ফলে কৃষকরা নিদারুণ আর্থিক অবস্থায় ভুগছে।

● আপনি তো গান্ধী আর লেলিনের কথাই বলছেন। গান্ধী বলেছিলেন 'গণ প্রতিনিধি' প্রথা দুর্ণীতির ভিত্তি। লেলিনের মতে পার্লামেন্ট শুয়োরের খোয়ার। আপনারাও একই ব্যবস্থার দোসর নন কি ?

সিকদার : গান্ধী, লেলিন বুঝিনা। ওসব নীতি চলেও না। 'গণ প্রতিনিধি' প্রথা বা পার্লামেন্ট শুয়োরের খোয়ার নয়। কিছু কিছু প্রতিনিধি তাদের চরিত্রটাই ওভাবে আসলে তৈরী করেছে। আমরা আসলে বলতে চাই, সেচযুক্ত জমিতে বেশি অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। যেমন কৃষক স্বয়ং সম্পূর্ণ হলে তার হাতে পয়সা আসবে। পয়সা আসলে দ্রব্য

কিনবে। দ্রব্য কিনলে শিল্প বাড়বে। আমরা এই প্রয়োগ চাই।

- সি.পি.এম পার্টিও তো একই অর্থনীতির কথা বলে ?

সিকদার : হ্যাঁ বলে বটে, তবে কাজে করে না। ভারতের মোট সেচযুক্ত জমি ৫১% শতাংশ। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ৩১.৮ শতাংশ সেচযুক্ত জমি। অথচ আমরা বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাজেটের ৪৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করেছি। আর বামফ্রন্ট, শোষিত মানুষের সরকার সেই জমির জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে ২৩ শতাংশ। কেন ? এটা কি প্রমাণ করে ?

- কেন্দ্রে আপনাদের সরকার আসলে কি এই নীতি থাকবে ?

সিকদার : অবশ্যই থাকবে ?

- সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চাকুরীর মৌলিক অধিকার সবই কি সংবিধানে থাকবে ?

সিকদার : অবশ্যই থাকবে।

- সরকারে জিতে আসার আগে প্রচার পর্যন্ত থাকবে ? অর্থাৎ ভোট ব্যাঙ্ক পর্যন্ত কি এই নীতি থাকবে না কাজে থাকবে ?

সিকদার : কাজেও থাকবে। কারণ চারটে রাজ্যে আমরা তার কিছু নিদর্শন রেখেছি।

- কিছু অপপ্রচারের জবাব দেবেন কি ?

সিকদার : কি ধরণের অপপ্রচার ?

● যেমন ধরুন, আমেরিকার যোগ সাজসে আপনারা এবং জামাত-ই-ইসলামি বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষে সংঘাতমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছেন, এ প্রসঙ্গে কি বলেন ?

সিকদার : আমরা আমেরিকার চূড়ান্ত বিরোধী। তাঁদের মত ঘৃণ্য ব্যবসাদারদের আমরা কীটতুল্য জ্ঞান করি। যেন রাশিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটায়, আমেরিকা তেমনি অর্থনৈতিক অবরোধ চালায়। সুতরাং ওদের সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা ওঠে না।

● শোনা যায়, ৬ই ডিসেম্বর জামাত-ই-ইসলামি দলের নেতা তথা পাক দালালকে বাংলাদেশে 'গণ ফাঁসীর' হাত থেকে বাঁচবার জন্য ; অন্যদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে 'গট্ আপ গেম'-এর অংশীদার হ'য়ে আপনারা এই কান্ড করেন। যেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। (এক সেমিনারে আজিজুল হকের ভাষণ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল)

সিকদার : উনি পাগল। ওকে রাচীর পাগলা গারদে ভর্তি করা উচিত। এখানকার বুদ্ধিজীবিরা সব জ্যোতিবসুর লেজুড় বৃত্তি করে। বুদ্ধি বেচে না খেয়ে ওদের উচিত, বুদ্ধিযোগী হওয়া।

"অযোধ্যাকাণ্ডে ভারতবর্ষে দাঙ্গার খতিয়ান"

রাজ্য	মৃত্যু	আহত	কার্ফু	১৪৪ ধারা	লুঠতরাজ	অগ্নি সংযোগ	ধর্ষণ
মহারাষ্ট্র	২১০	২৫০০	✔	✔	✔	✔	২
গুজরাত	২২০	৪০০	✔	✔	✔	✔	১
মধ্যপ্রদেশ	৯৫	১১০	✔	✔	✔	✔	
বিহার	২০	৩৫	✔	✔	✔	✔	
রাজস্থান	৪৮	৭৮	✔	✔	✔	✔	
অসম	১০৯	৩৯	✔	✔	✔	✔	
কর্নাটক	৬৫	৬০	✔	✔	✔	✔	
অন্ধ্রপ্রদেশ	--	৬	✔	✔	✔	✔	
কেরল	১২	১০	✔	✔	✔	✔	
তামিলনাড়ু	--	--	✔	✔	✔	✔	
পশ্চিমবঙ্গ	৩২	২৫	✔	✔	✔	✔	
উত্তরপ্রদেশ	২০১	৭০০	✔	✔	✔	✔	
ওড়িশা	৪	৯	✔	✔	✔	✔	
ত্রিপুরা	--	১	✔	✔	✔	✔	
হিমাচলপ্রদেশ	--	১	✔	✔	✔	✔	

"হিন্দু না মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন" ?

আতঙ্ক নগরী কলকাতা !!

শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

৬ই ডিসেম্বর বেলা ১২-৩০ টা নাগাদ লখনউ পুলিশ কনট্রোল থেকে এস টি ডি মারফত কলকাতা পুলিশে খবর এল অযোধ্যায় বিতর্কিত সৌধের প্রথম গম্বুজটি ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং অন্য দুটোও ভাঙার চেষ্টা চলছে। কলকাতা পুলিশে সোরগোল উঠল। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বসল পুলিশ পিকেট। কলকাতা তখনও ছিল কলকাতাতেই। অযোধ্যার করসেবা সহিংস হয়ে উঠার খবর আসতে থাকে বিকেল তিনটে নাগাদ। বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিসে টেলিপ্রিন্টারের ঝড় বয়ে যেতে থাকে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পদত্যাগ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বামফ্রন্টের ও জাতীয় ফ্রন্টের নেতারা মিলিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগ দাবী করলেন। সাড়ে ছটায় হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জরুরী বৈঠক, উত্তরপ্রদেশে জারী হল লাল সংকেত। মিরাটে ব্যাপক উত্তেজনার খবর, বারাণসী, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, কানপুরে, আলিগড়ে কার্ফু জারী, অযোধ্যায় হিংসাত্মক ঘটনা আর ব্যাপক অগ্নিসংযোগ। রাত ৮-৩০ টায় ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী।

অযোধ্যায় এই তাণ্ডবলীলার প্রতিবাদে ৭ই ডিসেম্বর বাংলা বন্‌ধ পালিত হয়। ইতিমধ্যেই কলকাতা সহ রাজ্যব্যাপী লাল সংকেতও জারী হয়েছে। সেনাবাহিনীকেও সতর্ক করা হল। এদিন থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু জারী হল সারা কলকাতা শহরে। বিশৃঙ্খলাকারীদের গুলি করার আদেশও জারী হয়। বাংলা বন্‌ধের জের কাটতে না কাটতেই পরের দিন ভারত বন্‌ধের ডাক দিল বাম ও রাষ্ট্রীয় মোর্চা জোট। মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে কংগ্রেসও সমর্থন করল ভারত বন্‌ধ। এদিনই বি-জে-পি-র দুই শীর্ষ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি ও মুরলীমনোহর যোশীকে গ্রেফতার করা হল। মেহরৌলিতে দিল্লীর নগর আদালতে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(ক) এবং (খ) ধারায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হল। এসবেরই প্রতিবাদ জানাতে পরের দিনই বি-জে-পি ডাকল ভারত বন্‌ধ। কংগ্রেস এবং ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট এই বন্‌ধের বিরোধিতা করল। এদিনই অর্থাৎ বি-জে-পি-র ডাকা ভারত বন্‌ধের দিনেই কলকাতার গার্ডেনরিচ ও মেটিয়াব্রুজ থানার একাংশ বাদে ৩৩টি থানা ও হাওড়ার দশটি থানা এলাকাতেই কার্ফু শিথিল করে দেওয়া হল। যদিও ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল।

বিপ্লবের শহর কলকাতা, সংহতির শহর কলকাতা, বামফ্রন্টের কলকাতা, কংগ্রেসের কলকাতা, হোপ-৮৬-র কলকাতা, নব আনন্দে জাগোর কলকাতা, জঞ্জাল নগরী, মিছিল নগরী, মহানগরী, সম্প্রীতির শহর, প্রমোটারের শহর, সাহিত্য-সংস্কৃতির কলকাতা, জ্যাম নগরী কলকাতা দাদাদের-হুকারদের-সমাজবিরোধীদের কলকাতা, মহামিছিলের কলকাতা হঠাৎই মধ্যরাতের আতঙ্ক নগরী হয়ে উঠল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এন্টালি, ট্যাংরা, মতিঝিল, বিবি বাগানের বস্তি। মুহুর্মুহু বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠল কলকাতার পূবদিক, দমকল সূত্রের খবর অনুযায়ী বুধবার রাত ১২ টার মধ্যেই কসবা থেকে

ট্যাংরা তিলজলা পর্যন্ত মোট আঠারোটি যায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। নিস্তব্ধতা ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছিল পুলিশ ও মিলিটারির রাইফেলের শব্দে। পরেরদিন ভোর থেকেই কলকাতায় জারী হল অনির্দিষ্ট কালের কার্ফু। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকেই সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী তার আগেই বুধবার রাতেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২৪৯, রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে হয়েছিল। বুধবারের ওই অভিশপ্ত রাতে চলেছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পনা মাফিক মূলতঃ সমাজবিরোধীদেরই নৈশ তান্ডব। এদের কোন জাত নেই। মেটিয়াবুরুজে যেমন দেখেছি প্রচুর হিন্দুদের বাড়ীঘর আক্রান্ত হয়েছে, মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হিন্দুর দোকান ভেঙেছে। আবার ট্যাংরায় ধোবিয়াতলায় তো শতকরা নব্বইজনইতো মুসলিম সম্প্রদায়ের, বিবিবাগানে মূলতঃ বিহারী সম্প্রদায়েরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশী। মতিঝিল বস্তিতে খ্রীষ্টানদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। রাধানাথ চৌধুরী রোড ধরে যখন ক্রমশঃ বিবিবাগানের দিকে এগোচ্ছিলাম যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা খান খান করে। কোথাও জানলা একটুকু ফাঁক করে, কোথাও দোতলার উপর থেকে মাথার উপর হাত তুলে গৌরাঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিশেষতঃ মহিলাদের অভিভাবকসুলভ ধমকানি। সারা চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। বুধবারের কালো রাত হয়ত ওদের জীবনে দুর্জয় কলঙ্কের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবেই আজীবন বহন করে নিয়ে চলতে হবে। যত কাছে এগোই পোড়া গন্ধ ততই উগ্র হতে থাকে। তখনও কোথায় কোথাও পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ধোবিয়াতলা বস্তিতে যখন পৌঁছাই তখনও ব্যাপক উত্তেজনা। আশেপাশে কয়েকটি প্রেসের গাড়ী ইতস্ততঃ ভাবে দাড়িয়ে আছে। এলাকার ডি.সি. মিঃ ঝা এসে পড়তেই অবস্থা আরও থমথমে। মতিনা বিবি বেরিয়ে এসে বললেন - পারবেন কি, আমাদের যোয়ান যোয়ান ছেলেদের সব ধরে নিয়ে গেছে, তাদের কি ফিরিয়ে দিতে ? কারও ছেলে, কারও ভাই, কারও স্বামী গুলি খেয়ে হাসপাতালে আছে, তাদের

কি হবে ? আক্রমণের আর লুঠতরাজের ঘটনা শুনে যে কেউই সহজে বুঝে নেবেন এসবই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। প্রথমে চলে লুঠতরাজ। তারপরেই ব্যাপক অগ্নি সংযোগ। বোমা ছুঁড়ে, মশাল দিয়ে এই অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রথমে তীক্ষ্ণ শিষ, দুয়েকটি বোমা বর্ষণ, তারপর দলবদ্ধ ভাবে এগিয়ে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমাবর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং লুঠতরাজ, হাঙ্গামাও শুরু হয় প্রায় একই সময়ে রাত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। অযোধ্যা দুঃখান্ত ছিল একটা উপলক্ষ্য মাত্র। সমাজবিরোধীরা আসলে পরিস্থিতি পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে। তপসিয়া, তিলজলা,ট্যাংরা, তালতলার এলাকায় চিহ্নিত অপরাধীরা না গিয়ে অন্য এলাকার সমাজবিরোধীরা হাঙ্গামা চালিয়েছে বলে পুলিশ মহলের ধারণা। অপারেশনের সময় যে ধরণের বিস্ফোরক বা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিও একই ধরণের। বুধবার সকাল থেকেই হঠাৎ বাজারে সুতলি দড়ি উধাও হয়ে গিয়েছিল। বোমা বানাতে তো সুতলি দড়ি লাগবেই। শক্তিশালী বোমা ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, অগ্নিসংযোগও ছিল দাবানলের মত। ধারাল অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে অপেক্ষাকৃতভাবে কম। কলকাতার অন্য অঞ্চলের সঙ্গে ট্যাংরার একটা তফাৎ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে দেখলাম আগুন লাগানোর ঘটনাই ঘটেছে বেশী। আগুন লাগানো হয়েছে অনেক রাবারের কারখানায়, চামড়ার গুদামে, সঙ্কটের মোকাবিলায় তৃণমূলে দলীয় কর্মীদের যোগাযোগের অভাব, কলকাতার পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের তথ্যসংগ্রহের ব্যর্থতায় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ৯ই ডিসেম্বর, রাত ১০-১০.৩০ টা থেকে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়া সমাজবিরোধীদের তান্ডবের ব্লু-প্রিন্ট আঁচ করতে পারেন নি। ট্যাংরা অঞ্চলের মানুষের বিস্তর অভিযোগ শুনতে হল এই থানার ওসি গদাই দের বিরুদ্ধে। এমনকি তার বিরুদ্ধে অনেক দেয়ালে পোষ্টারও চোখে পড়ল। এমনকি আশ্চর্যজনকভাবে এই বিপদকালীন সময়ে তাকে অসুস্থতার কারণে ছুটিও দেওয়া হয়েছিল।

মসজিদ বাড়ী লেনে রাত দশটা থেকে প্রায় ভোররাত পর্যন্ত চলেছিল তাণ্ডব এই অভিশপ্ত রাতেই। তিলজলা রোডে এস.আর. আলি জানালেন কিছু অপরিচিত চেহারার লোকেরাই এখানে তাণ্ডব চালায়। ২৮ কুষ্টিয়া রোডের বস্তিটি বোমা, বোতল, তরবারি নিয়ে সংগঠিতভাবে আক্রমণ করে দুষ্কৃতীরা।

তপসিয়া অঞ্চলে বুধবার, রাত ২-৩০ টায় সেনা নামানো হয়েছিল। পিকনিক গার্ডেন, সি.এন.রায় রোড, তিলজলা এবং সানি পার্ক প্রভৃতি অঞ্চলে বুধবার দুপুরের পর থেকেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে মুসলমান পাড়ায় ও হিন্দু পাড়ায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা আক্রান্ত হচ্ছেন। রাত এগারোটার পর থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত চলে ব্যাপক সন্ত্রাস, দফায় দফায় লুঠতরাজ, দুদিন পরেও তপসিয়া থানার সামনের চেহারাটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরিচ থানার বিপজ্জনক অঞ্চলগুলি সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেনাবাহিনীর কর্ণেল নাগরা। মেটিয়াবুরুজ থানার বদরতলা, আক্রা, সন্তোষপুর এলাকা তাই গত কয়েকদিনের তুলনায় অশান্ত হয় নি। ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। মেটিয়াবুরুজ থানা উপছে পড়ছে ধৃতদের ভীড়ে। উপদ্রুত এলাকাগুলিতে শুরু হয়ে গেছে চিরুনী তল্লাশী। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের কাজও চলছে। একটানা ১২০ ঘন্টা কার্ফু কবলিত গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে শনিবার (১২ই ডিসেম্বর) দু ঘন্টার কার্ফু শিথিল হতেই মানুষের ঢল নেমেছিল। এদিনই প্রথম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই এলাকায় ত্রাণ এল। সকাল ১১ টা নাগাদ কাছিপাড়া মোড়ে ভ্রাম্যমান গাড়ী বাজার এসে পৌঁছতেই চোখের নিমেষে সব উধাও হয়ে গেল। দু ঘন্টার কার্ফু শিথিল ; তবু আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে দেখলাম সেখানে পুলিশের গাড়ী দেখলেই মাথায় হাত তুলতে। মেটিয়াবুরুজের থানা এলাকায় তিন-চারটে যায়গায়ই

ব্যাপক দাঙ্গা হয়েছিল। বদরতলা, ভাঙাখাল, কাঞ্চনতলা, নিমতলা, নাদিয়াল, লিচুবাগান এবং আকরা রোডের কাশ্যপপাড়া এলাকায় ঘোরার সময় বারে বারে বিভিন্ন লোকের মুখে বহু নাম ঘুরে ফিরে এসেছে যে মেটিয়াবুরুজ থানার সঙ্গে এইসব বন্দর অঞ্চলের রিং মাষ্টারদের হরিহর আত্মার সামিল। পুলিশ মিলিটারির যৌথ অপারেশন সত্ত্বেও সেই সামাদ, ওহিদ, সামসুর এরা দিব্যি গা ঢাকা দিয়েই রইল। মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলের আকরা রোড এলাকা সারা দেশ খ্যাত রেডিমেড পোষাকের ব্যবসাকেন্দ্র, পর পর কয়েকটি সুপার মার্কেট, কাশ্যপপাড়া এই মার্কেট প্রেসের হার্ট থ্রব। কম করেও দশলাখ টাকা কাঠা জমির দাম শুনে রীতিমত থ বনে গেলাম। এখানে কিছুদিন যাবতই অবাঙালী প্রমোটাররা একের পর এক পুরানো বাড়ী কিনছেন। কাশ্যপপাড়ায় মূলতঃ তাদেরই বাড়ী ভেঙেছে, যারা প্রমোটারের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেননি।

বিহারের ভাগলপুর থেকে আসা একদল লোক আয়ুবনগরে এসে জমি দখল করেছে। তারা এখন ভাঙা খাল কাঞ্চনতলার মালিক হতে চায়। হুগলী নদীর তীর ঘেষে এই অঞ্চলের কাছেই ধানক্ষেত। এতেই জমির দাম ১৫ হাজার টাকা। হাঙ্গামাকারী বলে এলাকার বাসিন্দারা যাদের নাম বললেন সেই আফজল, মমতাজ, হবি, আলিজরা এখনও পুলিশের জালে না উঠায় এলাকার মানুষ স্বস্তিতে নেই। বদরতলায় ঘরে ঘরে নাকি বিদেশী জিনিষের রমরমা এখানেও জমি আর চোরাকারবারে সঙ্গেই বেশীরভাগ যুক্ত। বটতলা পুলিশ ফাঁড়ি, নাদিয়াল পুলিশ ফাঁড়িতেও এইসব সমাজবিরোধীরা আক্রমণ চালায় পরিকল্পনামাফিক, দুটো পুলিশ ফাঁড়িরই টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয়। কয়েকজন পুলিশ অফিসার জানালেন হাঙ্গামার সময় এলাকার জন্য মেটিয়াবুরুজ থানার কাছে ফোর্স চেয়ে পাননি। আর তাদের গুলি চালাবার অর্ডার ছিল না। কাজেই কাশ্যপপাড়া, কাঞ্চনতলা, নিমতলা প্রভৃতি অঞ্চলে হাঙ্গামা এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

কলকাতার পূর্ব-মধ্য এবং গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে কয়েকদিন ব্যাপক ঘোরাঘুরির পর যে কথাটা বদ্ধমূল হয়েছে ৯২-এর বর্ষশেষের লগ্নে এসে কয়েকটা দিন কলকাতা যে হিংসার উন্মত্ততায় মেতে উঠেছিল তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালানো আসলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্যই, দুয়েকটা অঞ্চল বাদে কোথাও সে অর্থে দাঙ্গা হয়নি। উভয় তরফেরই পার্টির আশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধীরাই ব্যাপক তান্ডব চালিয়েছে। গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ আর ট্যাংরা অঞ্চলের ধোবিয়াতলা বস্তি ছাড়া আর কোথাও হাঙ্গামা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়নি। এটি সম্পূর্ণভাবেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধীদের এলাকা দখল তথা লুণ্ঠনপর্ব, প্রতিশোধ নেওয়ার পালাও ছিল এর পিছনে। ট্যাংরা অঞ্চলে সাট্টা-চুল্লুর রমরমা, বেআইনি বস্তি বাড়ী, চায়না টাউন, চোরাকারবার মিলিয়ে মাসে কয়েক লক্ষ টাকা সমাজবিরোধীদের বাঁধা আয়। ট্যাংরা থানাও এই নজরানায় ভাগ বসাচ্ছে এমন বহু অভিযোগ এলাকার মানুষ বারে বারে শুনিয়েছেন। একটু দূরেই ই এম বাইপাস। ট্যাংরা ও এন্টালি দুটি থানার মাত্র ১ কিলোমিটার অঞ্চলেই এই হাঙ্গামা লাগানো হয়। অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল একানকার ধোবিয়াতলা, মেহের আলি লেনের বস্তিগুলি প্রমোটাররা গ্রাস করবে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বোঝা যায় তাদের এ ধারণা নেহাতই অমূলক ছিল না। পোড়া বস্তিতে ফিরে গিয়ে মাথায় পথিলিন আর বাঁশের খুঁটি লাগিয়ে তাদের অনেকেই আবার আস্তানা গেড়েছেন। অনেকেই ফিরছেন। কিন্তু মনে তাদের সর্বদাই শঙ্কা। আড়ালে না জানি কি কলকাঠি নাড়ছেন। রাজনৈতিক বংশদেরা আর আশ্রয়পুষ্ট সমাজবিরোধীরা। সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতারের নামে ভাঁওতাবাজিতে নাটের গুরুরা - দিলীপ, রানা, ভাল্লুক (বিষ্ণু হাজরা), বুচা, জগদীশ, সামসেদরা নিরাপদেই আছে। অন্যদিকে মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে কেউ কেউ তো রীতিমত সমাজবিরোধী ছাপ্পা তুলে রীতিমত সমাজসেবী এমনকি পুলিশসেবীও হয়ে পড়েছে। মেটিয়াবুরুজ গার্ডেনরিচ অঞ্চলেও

মানুষের মনে শঙ্কা দূর হওয়ার নয়। মোগল (মহম্মদ জাহাঙ্গীর), কানা মকবুল, বাবু আনসারী, টিটি, আনোয়ারেরা বহাল তবিয়তেই আছে। সমাজবিরোধী চাইদের গ্রেফতারের নামে তাদের বাড়ীতে যখন পুলিশ যাচ্ছে তখন তারা বাড়ী থাকছে না। কলকাতায় কয়েকদিনের হাঙ্গামায় গ্রেফতারের সংখ্যাতত্ত্বে পুলিশ শিরোপা পাওয়ার যোগ্য। ট্যাংরা অঞ্চলে, মেটিয়াবুরুজ-গার্ডেনরিচ অঞ্চলে বহু মানুষই দলবদ্ধভাবে বা এককভাবে এমন অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রেফতারের নামে নিরপরাধ ছেলে-যুবাদের পুলিশ এত ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় করছে এর বিরুদ্ধে আপনারা লেখেন না কেন ? দাঙ্গা বাঁধিয়ে, হাঙ্গামা লাগিয়ে, লুঠতরাজ চালিয়ে যারা বুভুক্ষু মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিল, নেপথ্যে রাজনীতির ফয়দা যারা লুঠলেন, রাজনৈতিক ছায়ার আড়ালে কলকাতার ৯২'এর ডিসেম্বরের কালো দিনগুলিতে যারা মহানগরীকে আতঙ্কে আর হিংসার উন্মত্ততায় লেলিয়ে দিয়েছিলেন তাদের কঠোরতম হস্তে দমন করার মত নৈতিক মনোবলও আর অবশিষ্ট নেই এই স্থবির প্রশাসনের। নিজেদেরই তৈরী এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের হাতেই তাদের পতন অনিবার্য, মানবশৃঙ্খল রচনার আগে নিজেদের শৃঙ্খলা ফেরানো আজ অনেক বেশী জরুরী।

সাম্প্রতিক দাঙ্গায় সরকারী মতেই এরাজ্যে রাজস্ব খাতে ক্ষতি হল ২৫ কোটি টাকা। বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছেন। কলকাতায় ৯টি আশ্রয় শিবিরে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। অনেকেই অবশ্য এখন ফিরেছেন। কলকাতায় এই কদিনে প্রায় ১ কোটি চিঠি আটকে পড়েছিল। এছাড়া কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যেসব ঘর-বাড়ি পুড়েছে, দোকান-পাট লুট হয়েছে, ভাঙচুর-এর তাণ্ডবলীলা চলেছিল তার সরকারী হিসাব এখনও মেলেনি। কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী কলকাতায় এই কদিনের হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে ৫০ জন গুলিবিদ্ধ হন। গত ১৩ই ডিসেম্বর অবধি হাঙ্গামার বৃহত্তর কলকাতায় ৭২টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা

ঘটেছিল। ব্যাপক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, গুলিবর্ষণ, ভাঙচুর, বোমবাজিতে সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ যে কত ব্যাপক তা বলাই বাহুল্য। সমাজবিরোধী লুঠেরারদের এই তান্ডবলীলাকে যারা হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ দিতে চাইছেন তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির অভাব কলকাতায় কোনদিনও ঘটেনি। এবারের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে তেমন সম্ভাবনা দেখা দিলেন মানুষ অনেক সংযম ও ধৈর্য্য দেখিয়েছেন। আগুন জ্বালিয়ে পোড়া ধ্বংসস্তূপের উপর দাড়িয়ে মেকী অশ্রুবর্ষণ আর নিরাপদ দূরত্বে রাজপথে সম্প্রীতির মিছিলের ঢল নামিয়ে দাঙ্গাবাজদের হাতকে শক্ত করারই ভানুমতীর খেল। নানা ধর্ম, বর্ণের, মনের মানুষের এই কলকাতায় 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই' স্লোগান আসলে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিরই নামান্তর। তারা ভাই ভাই হয়েই আছে। চিরকালই থাকবে। মিছিলনগরী কলকাতায় আজ সম্প্রীতির নতুন মিছিল চাই। সেই মিছিলে স্লোগান উঠুক "পুলিশ আর গুণ্ডা ভাই ভাই হওয়া চলবে না"। "সমাজবিরোধী আরস্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দাদা ভাই ভাই হওয়া চলবে না"। তাহলেই একমাত্র কলকাতা এমন দাঙ্গা আমাদের আর দেখতে হবে না। এমন দাঙ্গার খবর আর লিখতে হবে না।

ভয়ংকর ভাঙনের মাটিতে দৃঢ় প্রোথিত বিবেকানন্দ

পার্থ সারথি রুজ

"সাধুত্ব, পবিত্রতা এবং বদান্যতা পৃথিবীর কোনো একটি বিশেষ ধর্মের একান্ত সম্পাদ নহে। প্রত্যেক ধর্মমত হইতেই সর্বোন্নত চরিত্রের নরনারী আবির্ভূত হইয়াছে। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ স্বপ্ন দেখেন যে, অন্য ধর্মসমূহ লোপ পাইয়া তাঁহার ধর্মই কেবল টিকিয়া থাকিবে, তবে তিনি সম্পূর্ণ কৃপার পাত্র। তাঁহাকে বলিতে পারি, প্রতিরোধ সত্ত্বেও শীঘ্রই সকল ধর্মের পতাকার উপরে লেখা থাকিবে - 'সংঘাত নয় সহায়তা, বিনাশ নয় ভাবগ্রহণ, বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি''। এ উক্তি বিবেকানন্দের। আজ থেকে শত বৎসর পূর্বে এ জাতীয় উক্তি যাঁর তাঁকে কিন্তু আজ আমরা দাঁড় করিয়েছি উগ্র সাম্প্রদায়িকরূপে। কাল বিচার করবে তিনি সাম্প্রদায়িক না তিনি অন্য কিছু ?

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে স্বামীজি হিন্দু ধর্মের গুণগান করেছিলেন। তাঁর ভাষায় বলা যেতে পারে, "তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম সমর্থন করে প্রবন্ধ লিখে পাঠাও না কেন ? কে তোমাদের বেঁধে রেখেছে ?" বা "হিন্দুরা সবাই যদি নিশ্চিন্তে ঘুমায়, তবে হিন্দুধর্ম সমর্থন করবার জন্য আমার এত শক্তি অপচয় করার

দরকার কি বলো'' ? Modern Review পত্রিকায় দেখতে পাই 'He was not a mild Hindu. His Hinduism was aggressive Hinduism.'

বাস্তবিকপক্ষে হিন্দুধর্মের সমর্থনে তাঁর অসংখ্য বক্তব্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে। তবুও যখন তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় হিন্দুধর্মের মূল কথা কি ? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের মূল বস্তু হল ঈশ্বরে বিশ্বাস, নিত্যসত্য রূপে বেদে বিশ্বাস এবং কর্ম ও জন্মান্তর বাদে বিশ্বাস'। তাঁর আরো বক্তব্য যে 'হিন্দুধর্মে মানুষ সত্য থেকে সত্যে অগ্রসর হয়, নিম্নতর সত্য থেকে উর্দ্ধতর সত্যে, মিথ্যা থেকে সত্যে নয়'। বিবেকানন্দের হিন্দুপ্রীতি কে আরো ভালোভাবে বলা যায়, ''যদি প্রয়োজন হয়, সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি করো, বিধবাদের বিয়ে দাও, জাতি প্রথার মাথায় বাড়ি মারো, কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ কোরো না। সামাজিক ব্যাপারে প্রগতিশীল হও কিন্তু ধর্ম ব্যাপারে রক্ষণশীলতা রেখো।''

বিবেকানন্দের এই জাতীয় উক্তিগুলিকে অবলম্বন করে উগ্র এবং বিরোধী দুই গোষ্ঠীই আসরে নেমে পড়েছেন। বিবেকানন্দের প্রধান দোষ তিনি হিন্দুধর্মের গুণগান করেছেন। অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের ভাষায় বলি 'ধর্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদের কারণ নয়। যদিও তার উপাদানগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের কারণ নয়। যদিও তার উপাদানগুলি সাম্প্রদায়িকতাবাদের মতাদর্শগত বাহনের কাজ করে।' অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের এই উক্তির আলোকে আমরা বিবেকানন্দকে তাঁর ভাষায়, সমকালীন পত্র পত্রিকার বিচারে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে বিচারে প্রয়াসী হব।

কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে সংক্ষেপে ব্রাহ্ম সমাজের যে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তাতে দেখতে পাই, ''এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভবিষ্যতে যিনি বিবেকানন্দ নামে জগৎ বিখ্যাত হয়েছিলেন, তিনি

জেনারেল এসেমব্লী কলেজে পড়িতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় শ্রদ্ধার সহিত যোগদান করিতেন। .....ব্রাহ্ম সমাজ তাঁহার চিত্তের অনেক পরিবর্তন করিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষত্ব এই যে, ইহা মানবকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, যেখানে সত্য, সাধুতা ও পুণ্য তাহারই গুণগ্রাহী করে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের সংকীর্ণতার গণ্ডী ভেদ করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেখানে সাধুতা দেখিতেন সেখানেই তাঁহার প্রাণ আকৃষ্ট হইত। পরমহংস রামকৃষ্ণ তখন ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেন। ......নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সরল ও ভক্তিপূর্ণ জীবন দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ শিষ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই শিষ্য গুরুকে অসাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিয়াছিলেন।'' কিন্তু অধ্যাপক সুশোভন সরকার মনে করেন, ''রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের মত বিবেকানন্দও বিদেশীদের চোখে এদেশের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ দু'জনের মতো তিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ছিলেন না, ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁর কর্মকাণ্ড হিন্দু পুনরুত্থানের মনোভাবকে আরো পুষ্ট করে তুলেছিল।

অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু মনে করেন, ''স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ব্যাপক সর্বভারতীয় জাগরণ আনেন। তাঁর আরো অভিমত যে, বিবেকানন্দের সৃষ্ট জাগরণ প্রধাণতঃ হিন্দুদেরই জাগরণ। বহুধর্মের দেশ হলেও ভারতবর্ষে হিন্দুরা শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী। তাই হিন্দুদের জাগরণকে স্বচ্ছন্দে ভারতীয় জাগরণ বলা যায়। সংখ্যালঘুদের মধ্যে গরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানেরা ঐকালে শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর থাকায় প্রায় কোনো প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি।'' কিন্তু অধ্যাপক বিপানচন্দ্রের ভাষায় বলা যেতে পারে, ''উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনগুলি, যে আন্দোলনগুলি একত্রে ভারতীয় নবজাগরণ নামে

পরিচিত, কেবল আধুনিকীকরণের প্রতিনিধিত্ব করে নি। বরং তারা ধর্মীয় মৌলবাদ এবং হিন্দুধর্ম ও ইসলামের প্রত্যাবর্তনের প্রতিনিধিত্বকারী ছিল। অর্থাৎ আধুনিকীকরণের পাশাপাশি অনেক সময়েই ছিল সেই প্রক্রিয়া, যাকে সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন 'সংস্কৃতকরণ' এবং 'আরবীকরণ' বা 'ইসলামীকরণ'।

পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে বলা যায় "দেশের স্রোত অন্যান্য খাতে কাটিয়া বহিয়া চলিল এবং ব্রাহ্মসমাজের নদী ক্রমশঃ মরা নদী হইয়া দাঁড়াইল। ১৮৭২ সালে বঙ্কিম প্রতিভার নবরবি 'বঙ্গদর্শনের' ভিতর দিয়া দেশে এক নূতন প্রভাত উপস্থিত করিল। কিন্তু এই নূতন সাহিত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব ও আদর্শের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিল না। তারপরে এই নূতন সাহিত্যের সংগে সংগে রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকেও দেশের স্রোত ফিরিল। মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ইঁহারা 'ভারতসভা' স্থাপন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ কংগ্রেস কনফারেন্সের আবির্ভাব হইল তখন হইতেই পুনরুত্থানের যুগ দেখা দিল।...... রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের এক নূতন অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসের আন্দোলন উপস্থিত হইতে লাগিল। এ সমস্তের ভিতরকার কথা এই যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সভ্যতা পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম ও সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে খর্ব নয়। চাই কি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।"

মনস্বী বিনয় ঘোষ মনে করেন যে, "হিন্দু সমাজের উদারতা, মানবতা, ও সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনে পরিণত হল। 'হিন্দুপ্রীতি' ক্রমে 'হিন্দুত্ব' প্রীতির ভিতর দিয়ে 'সাম্প্রদায়িকতায়' পর্যবসিত হল। রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গল-বিদ্যাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের যুগ ধীরে ধীরে অস্ত গেল। যুক্তির বদলে এল সেই সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে এল কুসংস্কার,

উদারতার বদলে সংকীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা। মুসলমান বর্জিত তথাকথিত রেঁনেসাস ও রিফর্মেশন আন্দোলনের প্রায়শ্চিত্ত করা হল চরম প্রতিক্রিয়াশীল রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সূত্রপাত করে, বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি সব বিসর্জন ও বন্ধক দিয়ে। 'Age of Reason', 'Humanism', ও 'Philosophy of Enlightenment' এর উত্তরাধিকারীরা গুরু-অবতারের যুগের পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেন।'' প্রথম জীবনের অসংযত ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু পর্যন্ত ১৮৭২ সালে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনের একটা সচেতন প্রচেষ্টা দিকে দিকে সঞ্চারিত হতে থাকে।

কিন্তু অরবিন্দ পোদ্দার মনে করেন, ''বারতের নূতন সাংস্কৃতিক নির্মাতাগণ অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, আর হিন্দুত্বের চেতনা সংকীর্ণতার পঙ্কিল স্রোতে প্রবাহিত না করিয়াও কোন না কোন ভাবে তাঁহাদিগকে প্রভাবিত করিয়াছে। ধর্ম নিরপেক্ষ শ্রেয়ঃবোধ ও বাস্তববোধের বিকাশের পক্ষে সেকালীন সমাজ পরিবেশ তৈরী ছিল না। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা গাঢ় দৃষ্টিতে ফিরে তাকানো ছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নানাভাবে তুলে ধরা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে হানস কোন্-এর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : ''প্রতিটি সদ্যোজাত জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত প্রধান জাতীয়তাবাদী শক্তির সংগে সাংস্কৃতিক সংযোগ থেকে প্রাথমিক প্রেরণা পাওয়ার পর তা আপন অতীতের ভাব-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং প্রতীচ্যের যুক্তিবাদী ও সার্বজনীন মানদন্ডের সংগে তুলনা করে স্বদেশের পুরানো ঐতিহ্যের গভীরতা ও বৈচিত্র্যের গুণকীর্তনেও মত্ত হয়ে উঠেছে।'' ''ধূসর অতীতের ছায়াচ্ছন্ন ইতিবৃত্তের স্মৃতি এবং অনাগত ভবিষ্যের কল্পলোক থেকে স্বপ্নের যে পিতৃভূমি রচনা করেছেন জাতীয়তাবাদীরা তার সংগে বর্তমানের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।'' রাশিয়ার স্লাভোফিলরা পিটার দি গ্রেটের পূর্বেকার রাশিয়া থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল।

জাতি-কেন্দ্রিকতার এই বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে স্বকপোল কল্পনার বা বিমূর্ত ভাবনার ফল।

মনস্বী বিনয় ঘোষ মনে করেন যে, "১৮৭০-৭১ সালে যখন মুসলনাম সমাজের শিক্ষার দিকে ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, তখন তার মধ্যে কোন বিশেষ মুসলমান প্রীতি বা সমবেদনা বলে কিছু ছিল না। তাঁরা দেখলেন যে যদি এই সময় মুসলমান সমাজের মধ্যে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মধ্যশ্রেণী ও বিদ্বৎ সমাজের বিকাশের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা সাম্প্রদায়িক ভেদ নীতির উপর দাঁড়িয়ে আরো কিছুকাল রাজত্ব করতে পারেন। মুসলমান সমাজেও এর মধ্যে নূতন চেতনার বিকাশ হচ্ছিল। ঠিক এই সময় থেকেই হিন্দু মধ্যশ্রেণীরও বিদ্বৎ সমাজের ক্রমাবনতি আরম্ভ হল বললে ভুল হয় না। হিন্দু সমাজের উত্থান পর্বের মুসলমান বর্জিত রূপের অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি প্রকট হয়ে উঠল।" "যুক্তি বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ক্রমেই বাঙালী বিদ্বৎ সমাজের বড় একটা অংশ গুরুবাদ, ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল।"

কিন্তু ১৮৬৯ এর ২৭ শে এপ্রিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে বিবেকানন্দ লেখেন যে, "এখন নূতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নূতন বেদ। হে প্রভো, কবে এ পুরানোর হাত থেকে উদ্ধার পাবে আমাদের দেশ। গোঁড়ামি না হলে কল্যাণ দেখছি কই ? কিংবা ১৮৯৭ এর ৯ই জুলাই মিস্ মেরী হেলকে যে পত্র লেখেন তাতে দেখা যায়, "এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতীর কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোন শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘুমবো। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রনা ভোগ করি, ...যিনি তোমার অন্তরে

ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব পায়ে চলেন, তুমি যাঁর একাঙ্গ, তাঁরই উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা ভেঙে ফেল।''

১৯০০ খ্রীঃ ১৭ই জুন মিস্ মেরী হেলকে এক পত্রে বিবেকানন্দ লেখেন, ''খাঁটি উপনিষদের তত্ত্ব ও নীতিই আমাদের ধর্ম। তাতে আচার অনুষ্ঠান, প্রতীক ইত্যাদির কোন স্থান নেই।'' হরবিলাস সর্দা তাই লেখেন যে মাতৃভূমি এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রেমে তিনি পূর্ণ ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ 'মিরারে' যে সম্পাদকীয় লেখা হয় তাতে বলা হয়েছিল 'যে সহিষ্ণুতা এবং ভাবগত উদারতা হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং যা অন্য ধর্মের থেকে তাকে বহুলাংশে পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য দিয়েছে -সে বস্তুকে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে পৃথিবীর চোখে এত স্পষ্ট ও জীবন্তভাবে আর কেউ তুলে ধরেননি।''

তাই ১৯৬৩ সালে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী বলেছিলেন ''বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়েছেন। তার দ্বারা রক্ষা করেছেন ভারতবর্ষকে। তিনি না এলে আমরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতাম, ফলে স্বাধীনতা পেতাম না।''

বিবেকানন্দ লাহোরে ধ্যান সিং-এর হাবেলীতে 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি' এর উপর এ বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেন 'এই সেই ভূমি যাহা পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত ; এই সেই ব্রহ্মাবর্ত - যাহার বিষয় আমাদের মনু মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সেই ভূমি - যেখান হইতে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জন্য সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ প্রসূত হইয়াছে, ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে বোঝা যায় ভবিষ্যতে এইভাব সমগ্র জগৎকে প্রবল বন্যায় প্লাবিত করিবে। ....হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখানে - এই আমাদের প্রাচীন দেশে আমি আসিয়াছি - আমাদের মধ্যে কি বিভিন্নতা আছে তাহা বাহির করিবার জন্য নহে, আসিয়াছি আমাদের মিলন ভূমি কোথায় তাহাই অন্বেষণ করিতে ; কোন্ ভিত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে

আবদ্ধ থাকিতে পারি, কোন্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে যে বাণী অনন্তকাল ধরিয়া আমাদিগকে আশার কথা শুনাইয়া আসিতেছে, তাহা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে পারে। ......সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, দোষদর্শন যথেষ্ট হইয়াছে, এখন নূতন করিয়া গড়িবার সময় আসিয়াছে, এখন আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করিবার, এগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিবার সময় আসিয়াছে, সেই সমষ্টি শক্তির সহায়তায় বহু শতাব্দী ধরিয়া যে জাতীয় অগ্রগতি প্রায় রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা সম্মুখে আগাইয়া দিতে হইবে। .....আমরা হিন্দু। আমি এই 'হিন্দু' শব্দটি কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না ; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই। প্রাচীনকালে ইহা দ্বারা কেবল সিন্ধুনদের পূর্বতীরবর্তী লোকদিগকে বুঝাইত, আজ যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইহার কুৎসিত ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু নামে কিছু আসে যায় না। আমাদিগেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে - 'হিন্দু' নাম সর্ববিধ মহিমময়, সর্বাধিক আধ্যাত্মিক বিষয়ের বাচক হইবে, না চিরদিনই ঘৃণাসূচক নামেই পর্যবেসিত থাকিবে, না উহা দ্বারা পদদলিত অপদার্থ ধর্ম ভ্রষ্ট জাতি বুঝাইবে। যদি বর্তমানকালে হিন্দু শব্দে কোন মন্দ জিনিস বুঝায়, বুঝাক, এস, আমাদের কাজের দ্বারা লোককে দেখাইতে প্রস্তুত হই যে, কোন ভাষাই ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ আবিষ্কার করিতে সমর্থ নহে। যে সকল নীতি অবলম্বন করিয়া আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে একটি এই যে, আমি কখনও আমার পূর্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। ....যতই আমি অতীতের আলোচনা করি, যতই আমি পিছনের দিকে চাহিয়া দেখি, ততই গৌরব বোধ করি, ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, ইহা আমাকে পৃথিবীর ধূলি হইতে তুলিয়া আমাদের মহান পূর্ব পুরুষগণের মহতী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্যদের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদেরও হৃদয়ে সেই গর্ব আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস শোণিতের

সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের উদ্ধার সাধিত হউক। .....প্রত্যেক মানুষের যেমন ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেক জাতিরও সেইরূপ একটি ব্যক্তিত্ব আছে। .....প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন প্রকৃতির কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, যেমন তাহার নিজ অতীত কর্মের দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ দিকে তাহাকে চলিতে হয়, জাতির পক্ষেও সেইরূপ। প্রত্যেক জাতিকেই এক একটি বিধি নির্দিষ্ট পথে চলিতে হয়, প্রত্যেক জাতিরই জগতে কিছু বার্তা ঘোষণা করিবার আছে, প্রত্যেক জাতিকেই ব্রত বিশেষ উদযাপন করিতে হয়। ....জাতি-বিশেষের জীবন কোন নির্দিষ্ট ভাবের মধ্যে থাকে, সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব, যতদিন না তাহাতে আঘাত লাগে, ততদিন সেই জাতির মৃত্যু নাই। এই তত্ত্বের আলোকে আমরা জগতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপারটি বুঝিতে পারিব। বর্বর জাতির আক্রমণ তরঙ্গ বারবার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' - রবে ভারতগগন মুখরিত হইয়াছে, এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না, যে প্রতি মুহূর্তে নিজের বিনাশ আশঙ্কা না করিযাছে। জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার ও নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে। তথাপি আমরা পূর্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপই আছি, এখনও আমরা নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। শুধু তাহাই নহে আমরা বাহিরে যাইয়াও অপরকে আমাদের ভাব দিতে প্রস্তুত। বিস্তারই জীবনের চিহ্ন। আমরা দেখিতেছি, আমাদের চিন্তা ও ভাবসমূহ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, অন্যান্য জাতির মধ্যে স্থানলাভ করিতেছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থানে ভারতীয় ভাবধারা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহার কারণ এই মানবজাতির মন যে সকল বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে পারে, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বিষয় - দর্শন ও ধর্মই জগতের জ্ঞানের ভান্ডারে ভারতের মহৎ দান।'

তিনি আরো বলেন যে, "আমাদের পূর্বপুরুষগণ অন্যান্য অনেক বিষয়ে উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন - অন্যান্য সকলের ন্যায় তাঁহারাও প্রথমে বহির্জগতের রহস্য আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন - আমরা সকলেই একথা জানি। আর ঐ বিরাট মস্তিষ্ক সম্পন্ন অদ্ভুত জাতি চেষ্টা করিলে সেই পথের এমন অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন, যাহা আজও সমগ্র জগতের স্বপ্নেরও অগোচর, কিন্তু তাঁহারা উচ্চতর বস্তুলাভের জন্য ঐ পথ পরিত্যাগ করিলেন - সেই উচ্চতরবিষয়ের প্রতিধ্বনি বেদের মধ্যেই শুনা যাইতেছে : 'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।' - তাহাই পরা বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়। .....যে সকল বিদ্যা বা বিজ্ঞান আমাদিগকে শুধু অন্ন-বস্ত্র দিতে পারে, স্বজনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ক্ষমতা দিতে পারে, যে সকল বিদ্যা শুধু মানুষকে জয় ও শাসন করিবার এবং দুর্বলের উপর সবলের আধিপত্য করিবার শিক্ষা দিতে পারে ; ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অনায়াসেই সেই সকল বিজ্ঞান, সেই সকল বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা ওদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া একেবারে অন্য পথ ধরিলেন, যারা পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা অনন্তগুণে মহৎ, পূর্বোক্ত পথ অপেক্ষা যাহাতে অনন্তগুণ বেশী আনন্দ। ঐ পথ ধরিয়া তাঁহারা এমন একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইলেন যে, এখন উহা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পিতা হইতে পুত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে আসিয়া উহা আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে, আমাদের ধমণীর প্রত্যেক শোণিত বিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। এখন ধর্ম ও হিন্দু - এই দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই আমাদের জাতির বিশেষত্ব, ইহাতে আঘাত করিবার উপায় নাই। অসভ্য জাতিসমূহ তরবারি ও বন্দুক লইয়া বর্বর ধর্মসমূহ আমদানি করিয়াছে, কিন্তু একজনও সেই সাপের মাথার মণি ছুঁইতে পারে নাই, একজনও এই জাতির প্রাণ পাখিকে মারিতে পারে নাই। অতএব এই ধর্মই আমাদের জাতির

জীবনী শক্তি, আর যতদিন আধ্যাত্মিকতা অব্যাহত থাকিবে ততদিন জগতের কোন শক্তিই এই জাতিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। যতদিন আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মহত্তম রত্নস্বরূপ এই ধর্মকে ধরিয়া থাকিব, ততদিন আমরা জগতের সর্বপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দুঃখের অগ্নিরাশির মধ্য হইতেও প্রহ্লাদের ন্যায় অক্ষত শরীরে বাহির হইয়া আসিব। হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তবে তাহাকে আমি 'হিন্দু' বলি না। অন্যান্য দেশে রাজনীতির চর্চা লোকের মুখ্য অবলম্বন হইতে পারে। কিন্তু এখানে - এই ভারতে আমাদের জীবনের সর্বপ্রথম কর্তব্য ধর্মানুষ্ঠান, তারপর যদি সময় থাকে, তবে অন্যান্য জিনিস তাহার সংগে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। এই বিষয়টি মনে রাখিলে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব যে, জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীতকালে যেমন, বর্তমানকালেও তেমনি, চিরকালই তেমনি আমাদিগকে প্রথমে আমাদের জাতির সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতের বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিগুলিকে একত্র করাই ভারতের জাতীয় একত্ব সাধনের একমাত্র উপায়। যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই প্রকার আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা, তাহাদের সম্মিলনেই ভারতের জাতি গঠিত হইবে। ....আমাদের ধর্মের বিশেষত্ব, ইহার মূল তত্ত্বগুলি অতি উদার, যদিও ঐগুলি হইতেই অনেক বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি ঐগুলি সেই মূল তত্ত্বসমূহের কার্যে পরিণতরূপ – যে তত্ত্বগুলি আমাদের মাথার উপরের আকাশের মতো উদার এবং প্রকৃতির মত নিত্য ও সনাতন।''

১৯০০ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত ভাষণে বিবেকানন্দ বলেন যে, ''বেদান্তই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উপর জোর দিলেও বেদান্ত কোন কিছুর বিরোধী নয় - যদিও বেদান্ত কাহারও সহিত কোন আপস করে না বা নিজস্ব মৌলিক সত্য ত্যাগ করে না। বেদান্ত কোন পুস্তক নয়, বেদান্তে মনুষ্য সমাজ হইতে কোন ব্যক্তিকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া লইতে হয় না। বেদান্ত পাপ

স্বীকার করে না। তাঁর মতে বেদান্ত শিক্ষা দেয় সত্য জানিতে হইলে মানুষকে নিজের বাহিরে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।''

বেদ থেকেই বেদান্ত শব্দটি আসিয়াছে। ''হিন্দুধর্ম ও রামকৃষ্ণ'' এই প্রবন্ধের উপর তাঁর বক্তব্য, ''সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশ বিশেষে, কাল বিশেষে বা পাত্র বিশেষে বদ্ধ নহে। আর্যজাতির আবিষ্কৃত উক্ত 'বেদ' নামক শব্দ রাশি সম্বন্ধে ইহা বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই 'বেদ'। এই বেদরাশি জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ড - দুইভাগে বিভক্ত। কর্মকান্ডের ক্রিয়া ও ফল মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে বলিয়া দেশ কাল পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। জ্ঞানকান্ড অথবা বেদান্ত ভাগই নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সহায়তায় মুক্তিপ্রদ এবং মায়া পার নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশকাল-পাত্রাদির দ্বারা অপ্রতিহত বিধায় - সার্বলৌকিক, সার্বভৌম ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।''

'হার্ভেস্ট ফিল্ড' পত্রিকার মতে হিন্দুরা বিবেকানন্দকে হিন্দুধর্মের পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করলেও খ্রীষ্টান মিশনারীরা নবোত্থিত হিন্দু জাগরণে বেশ অসহায় বোধ করেছিল। তবে দেশীয় খ্রীষ্টান ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু জাগরণের বিষয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন তা হল, ''নিম্নবংশের সমভূমি থেকে শক্তিশালী সিন্ধুনদধৌত ভূমি পর্যন্ত, ঐতিহাসিক প্রয়াগ থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত ভারতে আলোড়িত উত্থান ঘটেছে, ভারতের প্রাচীন ধর্মমহিমার বিষয়ে চেতনা জাগরিত হয়েছে। প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন জ্ঞান ও দর্শন, প্রাচীন ধর্ম নিয়ে আলোচনাই এখনকার রীতি। চতুর্দিকে ভারতীয় ধর্মের জন্য উদগ্র আকাঙ্খা এবং যে কোন বৈদেশিক জিনিস সম্বন্ধে বিরূপতা। ভারতের বাইরে থেকে এখানে কোনো আধ্যাত্মিক মঙ্গলকর জিনিস আসতে

পারে না - ধর্মান্দোলনকারীরা দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এই ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। ....জাতীয়তাই এখনকার ধর্মনীতির নিয়ন্তা। সংকীর্ণ, অন্ধ, জাতীয়তাবাদী মনোভাবই বর্তমান হিন্দুরিভাইভ্যালের মূল ব্যাপার।"

কিন্তু বিবেকানন্দ লন্ডনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় (ধর্মের প্রয়োজন) বলেন যে, "অগণিত ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন - জাতি, জলবায়ু, এমনকি বংশের বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর। ইহা সুবিদিত সত্য যে, যাহারা একই ঈশ্বরের উপাসক, একই ধর্মে বিশ্বাসী, তাহারা একই বংশজাত লোকেদের এমনকি ভ্রাতাদের অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত পরস্পারের সাহায্য করিয়াছে। তাঁর আরো অভিমত যে, ধর্ম হইতে আমরা যে সকল তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারি, যে সান্ত্বনা পাইতে পারি, তাহা ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম অন্যতম বিজ্ঞান অথবা গবেষণার বস্তু হিসাবে মানবমনের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কল্যাণকর অনুশীলনের বিষয়। .....মানবমনকে গতিশীল করিবার জন্য ধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ামক শক্তি। ধর্ম আমাদের ভিতর যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে, অন্য কোন আদর্শ তাহা পারে না। ১৯০০ খ্রীঃ ২৮ শে জানুয়ারী ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনাস্থিত ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন যে "হিন্দুদিগের মধ্যে একটি জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবেন - তাহা আধ্যাত্মিকতা। অন্য কোন ধর্মে - পৃথিবীর অপর কোন ধর্ম পুস্তকে ঈশ্বরে স্বরূপ নির্ণয় করিতে এত অধিক শক্তিক্ষয় করিয়াছে, ইহা দেখিতে পাইবেন না।

ইংল্যান্ডের অন্তর্গত রিজওয়ে গার্ডেনস এ অবস্থিত এয়ার্লিলজে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, "যদিও সকল ধর্ম সম্প্রদায়ই 'হত্যা করিও না, অনিষ্ট করিও না, প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাসো' ইত্যাদি নীতি বাক্য শিক্ষা দিয়াছেন, তথাপি কেহই তাহাদের কারণ নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু হিন্দুরাই আধ্যাত্মিক গবেষণা সহায়ে ইহার

মীমাংসা করেন। ......হিন্দুগণ সবনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ ধর্মের মধ্যে নিহিত সর্বসাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং এই জন্যই সকল জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুগণই ধর্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার করে নাই।"

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' জনৈক প্রতিনিধির সংগে সাক্ষাৎকারে বিবেকানন্দ বলেন যে তাঁর ধর্মান্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিষ্কার করা এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়া দেওয়া।

'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেন ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা ও সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এদেশে দাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শংকর, কবীর, নানক, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ। অর্থহীন শব্দ নিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্বকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনাতৃপ্তির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে ? সমগ্র সমাজ শরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে, সমাজ একেবারে উদ্যমবিহীন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্বাদিগের ত্বঙ্মাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব। পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের প্রাণ নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞান মাত্রাশয় জৈন এবং অধিকৃত জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত ? কালে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রবল সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও সাম্যবাদের অতিশয্যোম্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা বর্বর জাতি পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টল টলায়মান হইল, তখন যথাসম্ভব পূর্বভাব-পুনঃস্থাপনের জন্য শংকর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার কবীর, চৈতন্য, ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজ না জন্মগ্রহণ

করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

'বর্তমান ভারত' এর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অংশে তিনি বলেন 'ভারতে উদ্দেশ। মুক্তি, ভাষা-বেদ, উপায়-ত্যাগ। পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য-ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা-অর্থকরী বিদ্যা, উপায়-রাষ্ট্রনীতি। .....তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগত থেকে শিখিবার কিছুই নাই ? তাঁর বক্তব্য..... আছে, কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, বুঝি, কোনও ইংরেজ পন্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।'

বিবেকানন্দ তাই বলেন, 'হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভাল মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র বা বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল ; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ?

তাই 'স্বদেশমন্ত্রে' তিনি বলেন 'হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘণ্য নিষ্ঠুরতা - এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না - তোমার নারি জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না - তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর ; ......ভুলিও না - তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত ; ভুলিও না - তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না - নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল - আমি ভারতবাসী। ভারতবাসী আমার

ভাই। বল - মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল - ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই - ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

কিন্তু যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার তিনি এত গুণগ্রাহী সেই সমাজের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের তথা রক্ষণশীল পত্র পত্রিকার দিকটি দেখাও প্রয়োজন। সে সময়ে বঙ্গবাসী ছিল হিন্দু রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী। এই পত্রিকা আমেরিকা প্রবাসী বিবেকানন্দকে 'হিন্দু' বলতে রাজী ছিল না। শশধর তর্কচূড়ামণি যিনি সেকালে তথাকথিত হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার পান্ডা, যদিও বিবেকানন্দের শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা যথেষ্টই ছিল, তিনিও হিন্দুধর্মের বিধানগুলি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। বঙ্গবাসী পত্রিকার মতে হিন্দুর পক্ষে কালাপানির পারে যাওয়া অক্ষমণীয় অপরাধ। তদুপরি বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীর পরিচয়ধারী, সুতরাং তাঁর অপরাধ 'অক্ষমণীয়তম'। 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ সংখ্যায় বঙ্গবাসী পত্রিকার একটি মন্তব্য থেকে জানা যায়, 'বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ......যে ব্যক্তি হিন্দুধর্মের সত্য আমেরিকার জনগণের কাছে ঘোষণা করেছেন, তাঁকে অনুরাগিগণ সম্মান করুন, সেটা তাঁদের কর্তব্য। সে কাজ না করলেই আমরা বরং দুঃখিত হব। আমাদের আপত্তি অন্য ক্ষেত্রে। যখন দাবি করা হয় - বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা, তিনি সন্ন্যাসী, দন্ডী,স্বামী, যোগী পরমহংস - তখনই আমরা কঠোর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হই। যাইহোক 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে,ব্রাহ্মণ ছাড়া দন্ডী সন্ন্যাসী হওয়া

যায় না, স্বামীজি তা নন। বিবেকানন্দ পরমহংস নন, এমনকি সন্ন্যাসীও নন। .....'সন্ন্যাসী আর্য ধর্মের, যাকে এখন সাধারণে হিন্দুধর্ম বলে, তার সৃষ্টি। আর, যে মানুষ হিন্দুধর্মের মধ্যে একটুও ঢুকেছেন তিনি কদাপি ম্লেচ্ছদেশে গমনের কথা ভাবতে পারেন না। ম্লেচ্ছভূমি - যে ভূমি সেখানকার জনগণের স্থূল, জড়বাদী চিন্তা ও আচরণের দ্বারা কলুষিত, সেই নিঃশ্বাসে বিষাক্ত। হিন্দুদের ভয় - সে ভয় খাঁটি যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত - যে মুহূর্তে হিন্দু স্থূল জড়বাদী মাটিতে পদার্পণ করবে সেই মুহূর্তে তার সকল আধ্যাত্মিকতা উবে যাবে। এবং যদি কয়েক দিন ঐ ভূমিতে থাকে, খাওয়া দাওয়া ও মেলামেশা করে, তাহলে তো আর ম্লেচ্ছামির ষোল কলা পূর্ণ হয়ে গেল। তাকে আর কখনও হিন্দুকোলে ফিরে নেওয়া সম্ভব নয়, সে হিন্দুত্বের কাছে চিরত্যাজ্য পুত্র।

কিন্তু বিবেকানন্দ ১৮৯৪ খ্রীঃ ২৭ শে অক্টোবর, আলাসিঙ্গাকে লেখেন 'যখনই ভারতবাসী 'ম্লেচ্ছ' শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ববিধ সংশ্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও। বেদান্তের কথা ফস ফস মুখে আওড়ানো খুব ভাল বটে, কিন্তু উহার একটি ক্ষুদ্র উপদেশও কার্যে পরিণত করা কি কঠিন ! ১৮৯৫ খ্রীঃ স্বামীব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে তিনি লেখেন... কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁদেরই ধর্ম হতে পারবে। আবার তাঁদের মধ্যে শশী আর বিমলাচরণ - এঁরা হচ্ছেন চন্দ্রসূর্যস্বরূপ। সাবাস, কি ধর্মের জোর রে বাপ ! ......তপ জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র। পৈশাচিক ধর্ম, রাক্ষসী ধর্ম, নারকী ধর্ম ?...... একশ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসী আরব্রাহ্মণ বদমাস দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। 'দেহি দেহি' চুরি বদমাসি - এরা আবার ধর্মের প্রচারক''। ১৮৯৫ এ আলাসিঙ্গাকে তাই তিনি লেখেন 'আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি ?'

বাস্তবিক পক্ষে বিবেকানন্দ ধর্মের গোঁড়ামি কে কখনোই প্রশ্রয় দেন নাই। ১৮৯৫খ্রীঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তাই লেখেন &Orthodox (আনুষ্ঠানিক) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে বা আচারী হিন্দু কোন্ কালে ? I do not Pose as one.' 'পরোপকারে নিজের উপকার' অংশে তাই তিনি বলেন "গোঁড়ারা ঠিকঠিক কাজ করতে পারে না। জগতে যদি গোঁড়ামি না থাকিত, তবে জগৎ এখন যেরূপ উন্নতি করিতেছে, তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করিত। গোঁড়ামি দ্বারা মানবজাতির উন্নতি হয় - এরূপ চিন্তা করা ভুল। পক্ষান্তরে বরং উহাতে উন্নতির বিঘ্ন হয়, কারণ উহাতে ঘৃণা ও ক্রোধের উৎপত্তি হয়, ফলে মানুষ পরস্পর বিরোধ করে। তাই ১৮৯৫ খ্রীঃ ৯ই সেপ্টেম্বর আলাসিঙ্গাকে এক পত্রে লেখেন, ...'কোন জাতি বিশেষের ওপর আমার তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের। ১৮৯৫ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি লেখেন 'আমার মতো অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাপ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেবো ? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মুর্খ বামুন কিনে নিয়েছে ? ১৮৯৭ খ্রীঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে তিনি লেখেন (যে পত্রটি মিস্ নোবেলের উত্তর) 'সকল জাতির মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তারিত হবে। ....আমরাগোড়া থেকে আমাদের দান ও অন্যান্য সৎকার্যে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ইতর বিশেষ করি না। ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেন 'ধর্মে ধর্মে যে দ্বন্দ্ব - তাহা অর্থহীন, কেবল কথার সংঘর্ষ মাত্র। তিনি আরো বলেন যে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা একটি ধর্মের অতি দ্রুত প্রচার হয় নিঃসন্দেহে কিন্তু সেই ধর্মের প্রচার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ধর্ম প্রত্যেককে তাহার মতের স্বাধীনতা দেয়.... দেববাণীতে তাই তিনি বলেন 'ধর্ম কেবল প্রত্যক্ষানুভূতি। বিভিন্ন মতামত - প্রণালী মাত্র, ওগুলি ধর্ম নয়। জগতের যত ধর্ম, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মেরই বিভিন্ন প্রয়োগমাত্র। শুধু মতবাদ কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয় ; দেখ

না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শান্তি হবে - তা না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। তাই তিনি দেববাণীতে বলেন 'প্রকৃত ধর্ম যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক সব ধর্ম, চুলোয় যাক সব শাস্ত্র। ধর্ম আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে।' ভক্তির প্রথম সোপান - তীব্র ব্যাকুলতা অংশে তাই তিনি বলেন 'লক্ষ লক্ষ লোকে ধর্মের দোকানদারি করে, সকলেই ধর্মের কথা বলে, খুব কম লোকই প্রকৃতধর্ম লাভ করিয়া থাকে। তাই 'ইষ্ট নিষ্ঠা' অংশে তিনি বলেন 'যে ভক্ত হইতে চায়, তাহার জানা উচিত 'যত মত তত পথ' - তাহার জানা উচিত, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশমাত্র। তিনি আরোও বলেন, '......ভক্ত যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন ; এমনকি তাঁহাদের সমালোচনা বিষয়েও যেন বিশেষ সতর্ক থাকেন ; তাঁহাদের নিন্দা শোনাও তাঁহার উচিত নয়। তাই তিনি বলেন 'অবশ্য এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা উদার, সহানুভূতি সম্পন্ন, অপরের গুণ গ্রহণে সমর্থ আবার গভীর ভগবৎ প্রেমসম্পন্ন। তাই গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ প্রবন্ধে তিনি বলেন 'ধর্ম - যাহা মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জিনিস, তাহাতে পাতা গোণারূপ অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় যে কর্তব্য ও প্রেম সম্বন্ধীয় সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহা অনুসরণ করাই তোমার কাজ।

আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি সামান্য একটি প্রবন্ধে বিবেকানন্দের সমস্ত বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে মুখে 'হিন্দু' 'হিন্দু' করলেও কিন্তু তিনি ছিলেন সেই হিন্দু, যিনি উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন এবং বিভিন্ন মত ও পথকে একই সংগে গ্রহণ করার

মানসিকতাসম্পন্ন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক। আসলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা কখনোই সাম্প্রদায়িক ছিল না, কিন্তু পরবর্তীক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীরা বিবেকানন্দেরর চিন্তাধারাকে জাতীয় আন্দোলনের সংগে সম্পৃক্ত করে যেভাবে হিন্দুত্বের প্রচারে সামিল হয়েছিলেন তারই ফলে তাঁর চিন্তাধারা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। সাম্প্রদায়িকতাবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতারা সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও তার প্রচার ঘটাতে পরবর্তীকালে তাঁর বক্তব্যকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলেও কিন্তু তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে।

তাই স্যার মির্জা মহম্মদ ইসমাইল বলেছিলেন 'স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ ধর্মপুরুষ। সব ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। ধর্মক্ষেত্রে কোনো ভেদ প্রাকারের ব্যবধান তিনি স্বীকার করেন নি।' লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাই বলেছিলেন বিবেকানন্দের ধার্মিকতা ব্যাপকতম অর্থবহ। তাঁর মৌল চিন্তাধারা আধ্যাত্মিক ও ধর্মের বাহ্যিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন 'আমি স্বাধীন চিন্তাধারায় বিশ্বাস করি। এইসব পবিত্র স্বভাব আচার্যগণের প্রভাব হইতেও একেবারে মুক্ত তাকিতে হইবে। তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করুন, কিন্তু ধর্মকে একটা স্বাধীন গবেষণার বস্তুরূপে গ্রহণ করুন।

তথ্যসূত্র :

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।

২। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ - শঙ্করী প্রসাদ বসু।

৩। আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ - বিপানচন্দ্র।

৪। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র - বিনয় ঘোষ।

৫। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব - অমলেশ ত্রিপাঠী।

৬। বাংলার রেনেসাঁস - সুশোভন সরকার।

৭। বঙ্কিমমানস - অরবিন্দ পোদ্দার।

৮। বাংলার বিদ্বৎসমাজ - বিনয় ঘোষ।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভারতীয় কবিকণ্ঠ

আশিস সান্যাল

সাম্প্রদায়িকতা আবার উত্তাল হয়ে উঠেছে। আঘাত হেনেছে আমাদের অস্তিত্বে। বাবরি মসজিদ ভাঙার ভেতর দিয়ে ভেঙেছে আমাদের মৈত্রী আর বিশ্বাসকে। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ উদ্যত করেছে তার কুটিল ফনা। বিবেকবান মানুষ মাত্রকেই আজ এগিয়ে আসতে হবে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজ জীবনের একটি মস্ত বড় ব্যাধি। এর সূত্রপাত আমাদেরস্বাধীনতা অর্জনের অনেক আগে থেকেই। ১৯৫৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'জাতীয় সংহতি সম্মেলনে' পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন : 'Some of our difficulties are inherited from the past,........ in fact the difficulties are accuring is an indication that we are fighting the evils which coue in our way. ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে তখন তাতে বিরোধ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য সুচতুরভাবে ইংরেজ শাসক সমাজ দেহে এই বীজ বপন করে পুরো মাত্রায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করেছিলেন। ভারতের দুটি প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে ঘটিয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত। ইংরেজদের ভাষা ও সংস্কৃতি নীতির ফল হিসেবে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও কৃষ্টির যে অসম বিকাশ

ঘটেছিলো, তারই অনিবার্য পরিণাম আজকের বিচ্ছিন্নতাবাদ। স্বাধীনতা লাভের পর এ বিষয়ে কিছুটা সচেতনতা দেখা দিলেও আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়াস যে খুব সক্রিয় — একথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। যা কিছু হয়েছে, তা মূলত রাজনৈতিক মুনাফালাভের দিকে দৃষ্টি রেখেই। পণ্ডিত নেহেরু অবশ্য বলেছিলেন : 'I am not disheartened by them. In fact, the way these difficulties are occuring, is an indication that we are fighting the evils which come in our way.

ভারতের সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবিরা কিন্তু প্রথম থেকেই এই অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ১৯৩৩-এর সাম্প্রদায়িক কলহ রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে বিচলিত করে তুলেছিলো। 'ধর্মমোহ' কবিতায় এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন —

'বিধর্মী বলি মারে পরম ধর্মেরে
নিজ ধর্মেরে অপমান করি ফেরে
পিতার নামেতে হানে সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক
জানে,
পূজা গৃহে তোলে রক্ত মাখানো
ধ্বজা
দেবতার নামে এসে শয়তান
ভজা'

নজরুল ইসলামও এই অমানবিক পশু শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল —

'হিন্দু না মুসলিম ? ও
জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কাণ্ডারী ! বলো ডুবিছে
মানুষ, সন্তান মোর মার।'

এই সময়ে তিনি আরো কয়েকটি কবিতা, গান এবং প্রবন্ধে এই অশুভ শক্তির পরিণাম সম্বন্ধে জনচিত্তকে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর 'ফণীমনসা' গ্রন্থের 'পথের দিশা' এবং 'হিন্দু মু সলমান যু দ্ধ' কবিতা দুটিতে এই মনোভাব স্পষ্ট। তিনি কবিতাদুটিতে সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রূপটি ফুটিয়ে তোলেন। 'পথের দিশা' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন –

'চারদিকে এই গুণ্ডা এবং
বদমায়েসির আখড়া দিয়ে,
রে অগ্রদূত চলতে কি তুই
পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে ?'

'হিন্দু মুসলমান যুদ্ধ' কবিতায় তাঁর মনোভাব আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই অশুভ শক্তির বিনাশ একদিন ঘটবেই। জাগরিত গণশক্তি এই পশুশক্তির ধ্বংস সাধন করবেই। তাঁর ভাষায় –

'করুক কলহ – জেগেছে তো তবু
বিজয় কেতন উড়া !
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন
স্বর্ণ লঙ্কা পুড়া।'

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবি, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবিরাও এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বারবার জানিয়েছেন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। অসমীয়া

ভাষার 'জোনাকি' যুগের প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্য সম্রাট লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন : 'হিন্দু আর মুসলমানের নিজেকে প্রথমে "ইণ্ডিয়ান" অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মানুষ এবং পরে হিন্দু বা মুসলমানের কথা বলা উচিত। অর্থাৎ যদি আমরা নিজেদেরকে যথার্থ ভারতীয় হিসেবে গঠন করতে পারি, তাহলেই একমাত্র সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব দূরীভূত হবে।' অসমীয়া ভাষার অপর বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী কবি অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর কণ্ঠেও শুনতে পাই বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ। শ্রীরায়চৌধুরী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালের 'সাদিয়ীযা নবযুগ' পত্রিকার কোন একটি সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতায় দেখি, তিনি ধর্ম, জাতি এবং প্রাদেশিকতার উপরে মানবতাকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর আলোচ্য কবিতাটির বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করা যাচ্ছে।-

'মানবতাকে বিদ্রূপ করা, দীর্ণ করা,
খর্ব করা,
উচ্ছেদ করা, ক্ষুব্ধ করা, হীন নীচ
করা, পঙ্গু করা,
না লাগে আমার পাকিস্তান
না লাগে আমার হিন্দুস্তান
না লাগে আমার শিখীস্তান
না লাগে আমার খৃষ্টীস্তান

লাগবে আমার —

মানবীয়তায় জ্যোতির্ময় করা
শান্তিময় করা, মহীয়ান করা
নবস্থান —।'

গুজরাটের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বেদনাহত ওড়িশার প্রখ্যাত কবি চিন্তামণি বেহেরা দেখেছেন চতুর্দিকে নিরাশার অন্ধকার। তাঁর সেই বেদনা প্রবাহিত হয়েছে প্রকৃতি লোকেও। সহোদরের বুকের রক্তে ভাসমান পটভূমির দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়েছে –

'সেই হাসি আর নেই
রাহু গ্রাস করেছে
পূর্ণ চাঁদের সেই উজ্জ্বলতা।
অথবা ফুটন্ত পদ্ম
বিন্দু বিন্দু শিশিরের জলে
ভুলে গেছে
আলোর জন্য জানাতে প্রার্থনা।'

উর্দু সাহিত্যেও এই সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে সুতীব্র প্রতিবাদ। বহু কবি ও সাহিত্যিক ধিক্কার জানিয়েছেন এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। হায়দারাবাদের প্রয়াত কবি সুলেমান আরীবের বহু রচনায় এই অমানবিক পশু শক্তির বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে তীব্র জেহাদ। প্রচণ্ড নিরাশার মধ্যে তাঁর মনে হয়েছে -

'নিজের কথা ভেবে নয় –
মানুষের কথা ভেবেই
আমি নিরাশ।
অথচ এই পৃথিবীতে আসার আগে
স্বর্গলোকে
অনেক শতাব্দী ধরে
আমরা একই সঙ্গে ছিলাম।

এখনও কি সেভাবে
আমরা সম্পর্কযুক্ত ?'

কবির মনে হয়েছে, ইহলোকে সেই সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমরা ধর্ম, ভাষা ও প্রাদেশিকতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। বিশিষ্ট উর্দু কবি শামসুর রেহমান ফারুকী এই মোহগ্রস্ত জনতার চিত্র আঁকতে গিয়ে লিখেছেন–

'এই হিংস্র জনতা
এগিয়ে চলেছে –
আকাশে
ইতস্ততঃ হিংসার তরবারি
বিক্ষিপ্ত করতে করতে
প্রতি মুহূর্তে
বাড়িয়ে চলেছে জঙ্গলের সীমানা।'

হিন্দী সাহিত্যেও দেখি বিবেকবান কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি সমাজ প্রথম থেকেই এই অশুভ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতার পরবর্তী কালেও সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির প্রভাব দেখে তাঁরা শিউরে উঠেছে। প্রতিবাদ জানিয়েছেন তীব্র কণ্ঠে। প্রখ্যাত কবি সমালোচক ও গল্পকার ডঃ প্রভাকর মাচওয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন তুলেছেন -

'এ কেমন অমানবিক হত্যাকাণ্ড ?
মাংসাশী জন্তুর চেয়েও বর্বর হয়ে
ওঠে ?
কেমন করে মানুষ
নেমে যাচ্ছে ক্রমাগত নরখাদকের
যুগে
ধর্মের নামে
আর সংহতির ধ্বজার আড়ালে

এই বর্বরতা
আসলে মানবতারই অপমান।
এর উৎস
যাই হোক না কেন
এবার সকলকেই তা অস্বীকার করতে
হবে।'

ভারতের সমস্ত ভাষাতেই কবি লেখকদের কণ্ঠে এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকজনের রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। যদিও একথা স্বীকার্য যে, সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া এই অশুভ শক্তির বিনাশ সম্ভব নয়, তবু এই শুভ প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। সমাজ মানসে এর প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। আজ চতুর্দিকে যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে, তখন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের ঐ বিষয়ে আরো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে, মনে করি। অসমীয়া কবি হীরেন ভট্টাচার্য লিখেছেন –

'সঙ্গীতের বিভিন্ন সুরের মতো
কোমল অথচ গভীর
বসন্তের সতেজ অরণ্যের মতো
উজ্জ্বল অথচ নিরহঙ্কারী
চারদিকে আমার দেশ
আর আমার দেশের মানুষ।'

এই পরিশুদ্ধ চেতনার আলোকে অবগাহন করে যদি সমস্ত ভারতকে আমার নিজের দেশ এবং ভারতের সমস্ত মানুষকে সহোদর মনে করতে পারি, তাহলেই এই অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটবে। বহুজাতিক ও বহুভাষিক এই ভারতবর্ষের প্রত্যেকের ভাষা ও সংস্কৃতির

বিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে মিলনের মহান ঐতিহ্য। আসামের বিশিষ্ট কবি ও রাজনীতিবিদ দেবকান্ত বড়ুয়ার কবিতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই বলি —

'মোর দেশ মানুহর দেশ
উত্তরে উত্তুঙ্গগিরি, দক্ষিণে
সাগর,
শতাব্দী বুকুরে বাগরে
পারে পারে সাজে ভাঙ্গে
কত ইতিহাস
ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, শিপ্রা আর
গঙ্গা যমুনার।

এই দেশ রাখিব লাগিব।
এই খন আপনার দেশ,
এই খন মরমর দেশ,
এই খন মানুহর দেশ।
(সাগর দেখিছা)

সম্প্রদায়, সংঘর্ষ ও সম্প্রীতি

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী

ক

১ ॥ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সব মানুষ নিয়ে সমষ্টি মানুষ নিয়ে সমাজ। কিন্তু মূল ইউনিট বা একক এক-একটি মানুষ, ব্যক্তি মানুষ। এই এককের দোষগুণ, ভালমন্দ বর্গীয় সমষ্টিতে বহুগুণিত হয়ে সমাজের চরিত্র নির্ধারণ করে। প্রতিটি মানুষ-ই বহু সম্পদের ধারক ও বাহক। প্রথম সম্পদ পারিবারিক - পুত্র-কন্যা, ভাই বোন, স্বামী-স্ত্রী, নিত্যযাত্রী প্রমুখ ভূমিকায় নানা সময়ে ও অবস্থায় তার স্থিতি ও বিস্তৃতি। তারপর ভাষা, ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী, অঞ্চল, সম্পদ, পেশা প্রমুখ নানা সম্পদের বিচিত্র পরিবার প্রতিটি মানুষ-ই বহুরূপী। কোন সম্পদ কারণেই মসৃণ ও ঋজু নয়, নিয়ত পরিবর্তনের কম্পনে বন্ধুর ও পংকিল। অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে প্রতিটি অবস্থান-ই দ্বন্দ্ব আন্দোলিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষের পরিচয় ও পরিচারণা পরিধি পল্লী পুর অতিক্রম করে স্বদেশ ও জাতীয় স্তর পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত এবং সাম্প্রতিক কালে মহাকাশেও পরিব্যাপ্ত। স্বল্প আয়ুকালের মধ্যে বিরাট বিশ্বকে জানার, পাওয়ার, আস্বাদনের দুর্জয় ক্ষুধা ক্ষিপ্র ও দুরন্ত করেছে মানুষের শক্তিকে, গতিকে করেছে

অশান্ত, অস্থির, কুটিল ও জটিলতর। সাধারণভাবে প্রতিটি একক এখন উদভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত। অসহিষ্ণু ও ক্ষুব্ধ বুভুক্ষু ও হতাশাগ্রস্ত। তবু কোন একক মানুষ-ই এক মিনিটের জন্যও থাকতে চায় না মানব সমাজের বাইরে। সমাজ-সম্পদ বর্জন করে থাকতে পারে না। মাছের কাছে যেমন জল। পশুপাখীর কাছে যেমন আলো-হাওয়া, মানুষ এককের কাছেও তেমনি অপরিহার্য মানব সমাজ। দার্শনিক পরিভাষায় মানব ও মানবসমাজের সম্পদ অনেকটা অভিনাভাবী অর্থাৎ একের অভাবে অপরের বিলয়। মানুষ সর্বাংশেই সামাজিক জীব।

২ ॥ ব্যষ্টি মানুষের গুণিত রূপ সমষ্টি। ব্যষ্টির দোষ-গুণ, ভাল-মন্দ সমষ্টি মানুষের মধ্যে সমর্পিত এই সমষ্টি মানুষের যে-অংশটি সমভাব-ভাবনা, সম স্বার্থবোধ ও সমান কর্মসাধনা সঞ্চিত ও তাকে বলা যায় সম্প্রদায়, প্রকারগত ভাবে সম্প্রদায়কে কয়েক স্তরে ভাগ করা যায়। এক-ভাষা, ধর্ম, জনগোষ্ঠী বা আধুনিকতা বিশিষ্ট সম্প্রদায়। দুই-পেশাগত (উকিল, লেখক, ব্যবসায়ী)। বিত্তগত (উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত), সম্পদ সৃষ্টি মালিকানাগত (শিল্পপতি, জমিদার, জোতদার) প্রভৃতি সম্প্রদায়। তিন-রাজনৈতিক দল, নানা মতাদর্শের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী শ্রমিক-কৃষক জাতীয় সমস্বার্থযুক্ত সংহতি। দল, পার্টি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, সংগঠন নানা নামে অভিহিত হলেও, সমস্বার্থ ও পথ আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত বলে এগুলির সাধারণ সংখ্যাও সম্প্রদায়। তবে গুরুত্ব ও বর্ণের দিন থেকে এদেরপাথক্য স্পষ্ট - কোনটা গভীর ও গাঢ়। কোনটা পাতলা ও ফিকে। প্রথম স্তরে - ভাষা, ধর্ম, জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মৌলিক ব্যবধান এই যে - প্রথম স্তরের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র জন্মলব্ধ ও অপরিবর্তনীয় অবশ্য ধর্মান্তরী ভবনের মধ্যে ধর্ম সম্প্রদায়ের

পরিবর্তনযোগ্যতা থাকলেও তার সীমা অতি সংকীর্ণ। দ্বিতীয়, তৃতীয় স্তরের সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাষ্টি সংঘর্ষের সংযুক্তি স্বেচ্ছাধীন কাজেই পরিবর্তনশীল। দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ। মুজর মালিকের শ্রেণী সংগ্রাম, নিম্নবিত্ত-উচ্চবিত্তের বিবাদ, এমনকি জাত-পাত নিয়ে যে বিরোধ এগুলিওসাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে ব্যাখা মরা হয় না। সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রদায়িকতা শব্দটির ব্যঞ্জনায় যেমন ধর্ম, ভাষা ও জনগোষ্ঠী বা আঞ্চলিকতা পুষ্ট ধ্যান ধারণা বুঝায়।

৩।। জাতীয় সংহতি বিপ্রতিপ কোণে বিচ্ছিন্নতাবাদ শব্দটি-ও দেয়ালের প্রাচীর পত্রে, মিছিলের গণ হুংকারে এবং নেতৃবর্গের ভাষণে ও ইস্তাহারে বার বার দৃষ্ট ও শ্রবণগোচর হয়। এটা অবশ্য সম্প্রীতির বিষয়, নয়, সংহতির ব্যাপার। তবু-ও সমৃদ্ধ, সুস্থ জাতীয়তাবাদ ও বোধের দিক থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি দুটি-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্থ অখণ্ড সংহত, জাতীয় জীবন থেকে অর্থাৎ সার্বভৌম গণতন্ত্রী ভাষাও থেকে বেরিয়ে যাওয়া। কোন অঞ্চলের অধিবাসী - ভাষা বা গোষ্ঠী আঞ্চলিকতা এমনকি ধর্মের ভিত্তিতেও যদি এক একটি রাজ্যের সমান মর্যাদা দাবী করে - যেমন ঝাড়খন্ড, বড়ো আন্দোলন। এমনকি পাঞ্জাবের বা কাশ্মীরের, আন্দোলনকে কিভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলা যায়? পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যদি স্বাধীনতা দাবী করে। ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তখন তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী - তার আগে নয়। ধর্মের ভিত্তিতে যদি কোন রাজ্য ভাগ হতে চায় তবে তা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরোধী - অবশ্যই, সংবিধান বিরোধী। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়।

খ

৪ ॥ বিচারের সার্বভৌম ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সূত্র এই যে সব কার্যের-ই কারণ আছে বা কারণ ছাড়া কার্য ঘটে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। শুধু আদিভৌত্তিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রাকৃ তিক জগৎ সম্বন্ধেই নয়। এমনকি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিধারণায়-ও এই সূত্র - কার্য কারণ শাশ্বত স্বীকৃত। প্রবহমান মানব সমাজে যা কিছু ঘটেছে ঘটছে, ঘটবে সব কিছুর-ই কারণ আছে। কারণ না বুঝে কার্যকে যথাযথ বুঝা যায় না। দেহের উপরে যে তাপ তার কারণ দেহের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ রোগজীবাণু ক্রিয়াজাত - সেটি না জানলে রোগ নিরাময় হয় না। প্রতিষেধক টীকার উদ্ভাবন অসম্ভব হয়। সব কিছুর-ই কেন ? - এই প্রশ্নটির নির্ভুল জবাব চাই। বাহিরে প্রকাশিত ঘটনা বা কর্মের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল - ব্যষ্টি মন ও সমষ্টি মন - দুটি সম্বন্ধেই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ভারতভূমির সামান্য আলোচনার পূর্বে - বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং সাম্প্রতিক পরিণামে যা ঘটেছে - ভারতের ঘটনাবলী তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

৫ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানে একদিন যেমন এশিয়া-আফ্রিকার কতগুলি দেশ যেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করে অন্যদিকে চক্রশক্তির শোচনীয় পরাজয়, আনবিক বোমার অধিকারী আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবে ইউরোপ ও এশিয়ায় রাজ্যের পুনর্বিন্যাস - জার্মানীর দ্বিখন্ডন, ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি ভিয়েৎনাম প্রভৃতি বিভাজন তৃতীয় শক্তি হিসেবে নিরপেক্ষ শক্তি প্রতিষ্ঠা। জাপানের পূর্ণ প্রকাশ শেষে সোভিয়েট রাশিয়ার অবলুপ্তি - মধ্য প্রাচ্যে অশান্তি। একদিকে

দুই জার্মানীর মিলন - অন্যদিকে ঐক্য প্রয়াস, জাতী-ভাষা-গোষ্ঠী-বর্ণ ভিত্তিক নয়া খন্ডন প্রক্রিয়া। মিলন ও বিচ্ছেদ দুই বিরোধী মানসিকতা বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সহাবস্থিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতি - জীবন ও মৃত্যুর শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য একটা - দুঃখকষ্ট, হয়, তার তুলনায় মানুষের সৃষ্ট নানা ঘটনার সংঘাতে - মানুষ ততোধিক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে। ভারত বা যে কোনো দেশ বিচ্ছিন্নভাবে তা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাবে কেমন করে ?

৬।। অর্থাৎ ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল দ্বিজাতি সূত্রে। ধর্ম ও জাতী (nation) একার্যে গৃহীত হয়েছিল। দুই দেশের নাম - পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান। যদিও এতাবদকাল - হিন্দুস্তান বলতে - অখন্ড ভারতকে-ই বলেছে এদেশের ও বিদেশের মানুষ। এই জন্মভূমির অপবিত্র হয়ে গেল। রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হল। ধর্ম হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান আলাদা। বিদেশী শাসক ভারতীয় জনগণের এই অনৈক্যের দিনটা ব্যবহার করেছেন - রাজনৈতিক কূট বুদ্ধির স্বাভাবিক সূত্র হিসাবে। প্রথম বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) সংঘঠন ব্যাপারে লর্ড কার্জন - মুসলীম লীগ সংগঠন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজবপন করেছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রী ও মোল্লারা - ধর্মান্তরীকরণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। আর ধর্মান্তরিতর হিন্দু সমাজে প্রত্যাবর্তনের পথ না থাকায় এটা ছিল একপেশে। তীতুমীর মুখ্যতঃ হিন্দুবিরোধী জেহাদ জলেও যেহেতু ইংরাজশাসন তার বাধা হয়েছিল, সেইসূত্রে বহু ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে স্বাধীনতার আন্দোলনের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। ১৯২১ অসহযোগ আন্দোলনে - খিলাফৎ আন্দোলনকে - একান্তভাবে ইসলামী ধর্মী একটি বৈদেশিক ইংরাজ বিরোধী উত্তেজনাকে

কাজে সামিল করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই বিভেদ বীজটি অংকুরে বিনাশ করার প্রয়াস হয়ত তাঁর ইচ্ছে ছিল। তখন মিছিলে তিনটি আওয়াজ উঠত - 'বন্দেমাতরম্ আল্লাহো আকবর', মহাত্মাগান্ধী জী কী জয়। ধর্ম ও জাতি (nation) সমার্থক নয় - একথা কে না জানত ? তবু ভারত বিভক্ত হল। কংগ্রেস দল তত্ত্ব মানলেন না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা মানলেন পাকিস্তান ইসলাম ধর্মীয় দেশ হলেও ভারত রইল সেকুলার - ধর্মনিরপেক্ষ। দ্বিতীয় পর্যায় ভাষা-কে ভিত্তি করে পাকিস্তান ভেঙে গেল নিদারুণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে। বাংলাদেশ তৈরী হল ধর্ম নিরপেক্ষ দ্বিতীয় দেশ এই উপমহাদেশে। মুজিব হত্যার পর ফৌজী এক নায়কত্বে পড়ল নতুন পাশার দান - বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র হয়ে গেল। ধর্ম ন্যাশানালিটি যে একার্থক নয় তা ইসলামের খন্ড রাষ্ট্র ও পরিবর্তিত মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালে বুঝবেন ইরাক, ইরান, কুয়েত, মিশর, সৌদি আরব, তুর্কি, আফগানিস্তান প্রমুখ ইসলামী দেশের বিরোধ ও সম্প্রীতিহীনভাব কারণ গুলি বিশ্লেষণ যোগ্য। লক্ষণীয় যে মুসলিম ঐক্যের জিগিরটি কিন্তু ইসলামী নিজের দেশের প্রতি নয়। অমুসলিম দেশের দিকে উদ্যত।

৭ ॥ জন্মসূত্রে পাক-ভারত বিরোধটা - মুখ্যতঃ পাকিস্তানের দিক থেকেই আগ্রাসী ও উদ্যত। প্রথম সূত্র কাশ্মীরের দমন নিয়ে। রাজা হরিসিংয়ের ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত এবং তা ভারতকর্তৃক স্বীকৃতির পর আরম্ভ হল যুদ্ধ। কাশ্মীর সমস্যাটা একটা চিরস্থায়ী গত হয়ে একাধিক যুদ্ধের হেতু হয়ে আছে। কয়েক বার পরাজিত - পাকিস্তান কোন মৈত্রী প্রস্তাব অকপট ভাবে নিতে পারছে না। অধিকন্তু পাঞ্জাবী শিখ সম্প্রদায়ের অসন্তোষকে একটি স্থায়ী বিদ্রোহে পরিণত করার জন্য - অস্ত্র

অর্থে - প্রশিক্ষণে সহায়তা করেছে। আন্তর্জাতিক শক্তি চক্রের হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের মৈত্রী - আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব ও পরে চীনের সঙ্গে প্রীতি সম্বন্ধে যুক্ত হয়েছে। আর্থ সামাজিক কোন স্বার্থ বা সমুন্নতি নয় সামরিকভাবে ভারতকে জবাব দেওয়াই হয় এর লক্ষ্য - পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে উত্তর দিক থেকে যে উদ্বাস্তু সমাগম হয়ে ছিল তার চাপে ভারতের মতো পাকিস্তান-ও জর্জরিত। জন বিনিময় - ধর্মভিত্তিতে- প্রশ্নটা এক সময় উঠেছিল। কিন্তু তা ভারতের আদর্শের দিক থেকে বাস্তব সত্য হিসাবেও অনুমোদিত ও উৎসাহিত হয় নি। কাজেই পাকিস্তানে ও বাংলাদেশ হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ আছেন যারা ভারতবর্ষের ইসলাম সম্পর্কিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নির্যাতনের শীকার হন। তিন সত্ত্বে বিভক্ত হলেও মানসিকতার একাত্ববোধ সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ব্যাপারে বিচ্ছিন্নভাবে একা ভারতের পক্ষে ভাবাগত নয় - সম্ভবও নয়।

গ

৮॥ ধর্মীয় মৌলবাদ ও গোড়ামি ও ব্যক্তিগত আচার আচরণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে কোন কোন মানুষের মধ্যে তাতে যদি বিপদ থাকে না। কিন্তু তা যখন সমষ্টির মধ্যে দানা বাঁধে - তথা উদ্বেগের হেতু হয় - সাবধানের সূচনা করে। সাধারণ মানুষের ধর্মবুদ্ধি সরল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক ও সামাজিক গুণ বলয়িত। প্রীতি, সহিষ্ণুতা, দয়া, সহানুভূতি প্রমুখ গুণগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত - নেতৃস্থানীয় মানুষের প্রোরনায় - ধর্মের নামে যখন সংঘবদ্ধ গোড়ামির জন্ম হয়। তখন স্বাভাবিক সহজ মানবিক বুদ্ধির লোপ হয়ে

যায়। এই অবস্থা ভয়ংকর। সংখ্যা। লঘু মানসিকতার মনে আত্মবলীর জন্য এই রকম পরিস্থিতি হতে পারে - আগ্রাসী অসহিষ্ণু হতে পারে, কিন্তু যেখানে সংখ্যালঘু নয় যেমন বাংলাদেশে পাকিস্তানে মুসলমান বা ভারতবর্ষে হিন্দু - সেখানে এ গোঁড়ামি ও তার বীভৎস প্রকাশ হয় কেন ? এর কারণ অনুধাবনযোগ্য। প্রতিক্রিয়াজাত - ক্ষেত্র ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান মানসিকতার পার্থক্য বিচার্য। বিশ্বাস ও আচরণান্বিত কঠিন কাঠামোর জন্য মুসলমান সম্প্রদায় যেমন সহজে উত্তপ্ত হয়ে উঠে ধর্মের নামে হিন্দুরা তেমনটি হয় না। বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য ও আচরণের বৈচিত্র্যের জন্য সমষ্টিগত ভাবে হিন্দুরা সেইভাবে ততটা উত্তেজিত হয় না। আর্থ সামাজিক কারণ-ও আছে। কিন্তু ধর্মীয় আবেগটাই মুখ্য ভয়, প্রবঞ্চনা ও হতাশা থেকেও এমনভাব আছে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে - ভারতবর্ষে ও উপমহাদেশে কোন কারণ গুলি কার পক্ষে সমধিক প্রযোজ্য ?

৯ ॥ সিপাহী বিদ্রোহত্তর ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবোধের জন্ম হয় এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয় তার পুরোভাগে ছিল হিন্দুরা। শিক্ষাগত অগ্রসরতা একটা হেতু অবশ্যই, কিন্তু একমাত্র হেতু নয়। এদেশের মুসলমানদের অধিকাংশ ধর্মান্তরিত - আরব দেশের বংশধরের সংখ্যা কম। কিন্তু ধর্মীয় দিক বাদ দিয়েও ভারতীয় সংস্কৃতি - ভারতরাষ্ট্রের প্রতি - আনুগত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সীমাবদ্ধতা আছে। ''আমি আগে মুসলিম'' - তারপর ভারতীয় এবং ''আমি আগে ভারতীয় তারপর মুসলিম'' - এই দুটি এককথা নয়। আমি জাতিতে ও হিন্দু, ধর্মে মুসলিম'' বলতেন বিচারপতি চাগলা -- অর্থাৎ জাতীয় আনুগত্য ভারতের প্রতি অকুণ্ঠ। জন্মভূমি ও আনুগত্যের এই দ্বিধা স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম সংযোগ

কম হওয়ার কারণ। এই ব্যাপারে একদল হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তা নায়ক ও নেতা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ভারতের ভাগ্য ভারতীয় হিন্দুদের ভাষা বোধের উপর মূলতঃ নির্ভরশীল। বহু ভাষা, শ্রেণী, জাতপাতে বিভক্ত হিন্দুজাতিকে সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়ে 'ভারতমাতা' কে উপাসা করে একটি সংগঠন করা প্রয়োজন। হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট চেতনা নিয়ে এগিয়েছিলেন বীর সাভারকর। এই এক উদ্দেশ্য নিয়েই ডঃ কেশব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ যে প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন তা মুখ্যতঃ ধর্মীয় এবং গৌণত জাতীয় ঐতিহ্য বলয়িত কিন্তু সাভারকর, ডাঃ কেশব যা করেছেন তা হিন্দু জাতীয় ঐতিহ্যমন্ডিত। মৌলবাদ বা Fundamentalism শব্দটি উদারপন্থার বিপরীত কোণে-অবস্থিত। কিন্তু যাঁরা কেশবকে উক্ত ও প্রতিষ্ঠিত ভাব ভাবনা, ক্রিয়া কর্মকে গোঁড়া হিন্দুবাদ বা হিন্দু মৌলবাদ বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন। কারণ তাঁদের চিন্তাধারা মূলতঃ যুক্তিবাদ ও ঐক্য চেতনা সমৃদ্ধ। অবশ্যই মতানৈক্য থাকবে কিন্তু মৌলবাদের ছাপ দিয়ে - নির্বিকারে গাল দেওয়া এককথা বিশ্লেষণ মূল্যায়ণ অন্য।

ঘ

১০।। বাবরী মসজিদ ও রামজন্মভূমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে -৬ই ডিসেম্বর যে কান্ডটি হয়ে গেল - তা আকস্মিক কিনা, বা পূর্ব পরিকল্পিত কিনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বিজেপি প্রবঞ্চনা করেছে কি না - তবে তদন্ত ও সত্য নির্ণয় হয়ত হবে। কিন্তু প্রাচীন সৌধটি বিধ্বস্ত করা যে হঠকারিতা ও অনুচিত কর্ম হয়েছে - এ বিষয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই। কোন বিশেষ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমেরকথা নয়। রাজনীতি বা সুবিধা

অসুবিধার বিষয় না, আসল কথা হচ্ছে এটি ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির পরিপন্থী কাজ যে হিন্দুধর্মের কথা - স্বামীজি চিকাগো ধর্মসভায় ঘোষণা করেছিলেন (১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) - তা উদ্ধার করি – I am proud to belong to an religion which has taught the world both to tolerence and universal acceptance. We belong not only in universal toleration, but we accept all religions astrue. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of our earth – এই ধ্বংস কর্মের মধ্যে আমরা এই সমস্ত উদার বিশ্বধর্মের, মানব ধর্মের, আমাদের ঐতিহ্যের অবসান করেছি। এই লজ্জা, আন্তরিক ভাবে সকল হিন্দুর, পঠন ভফান স্বামীর।

১১॥ এই ধ্বংসের জন্য ভারতে ও পাকিস্তান, বাংলা দেশে ও বিদেশের মুসলিম অঞ্চলে কী হয়েছে - সেটা মূল আলোচ্য নয়। এই পরিণতি হল কেন সেটায় জিজ্ঞাসা। ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ঠিক চালু রাখা রাজনীতির একটি লাভ জনক বাণিজ্য - ভোট ব্যাংক - বলে অভিহিত করেন অনেকে। ধর্মীয় সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় - বিশেষ করে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যেখানে দেশ বিভাগ হয়েছে - যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও হিন্দুপ্রধান সমাজ ও পরিবেশকে কিছুটা ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখতে পারে। তাদের আশ্বস্ত করার জন্য দুটি কাজ করা যায় - এক, ধর্মনিরপেক্ষ মূল জাতীয়ধারার মধ্যে সমর্থন করা। দুই বিশেষ সংরক্ষণ দিয়ে তাদের আলাদা করে রাখা। দ্বিতীয়টিও তাদের মনে কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যায় কিছুক্ষণ - কিন্তু যত সময়েই - বিজাতীয় হয়ে থাকতে হবে দ্বিজাতি তত্ত্বের দায় বহন করতে হবে। এদের

মানসিকতার অবস্থান -- আমরা প্রথমে মুসলমান - তারপর ভারতীয়। আর প্রথম ধারার সামিল হলে - ভারতীয় জাতি হিসাবে তার ঐতিহ্যের ধারক হয়ে মূল স্রোতের সঙ্গে এক হয়ে যাবে - বিশেষ কিছু সুযোগের প্রতীক্ষা করবে না, তারা প্রথম ভারতীয় তারপর মুসলমান। কোন ধর্মের জন্য কোন বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ ধর্মনিরপেক্ষতায় নেই। কিন্তু জাতীয় ঐক্য ধারায় সামিল ও আনুগত্য আছে। ধর্ম যাই হোক - জাতি পরিচয় ভারতীয় রাজনৈতিক দল - যারা ভোটটাই একমাত্র মনে করে এবং যে কোন উপায়ে মসনদ দখল করা একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। নানা রকম অসদুপায়ের সঙ্গে -- স্বতন্ত্র করে আলাদা ধর্মীয় সংখ্যা লঘু অস্তিত্বের রক্ষাকবচ করে - তাকে ব্যবহার করতে চায়। মূল স্রোতে আনার অন্তরায় সৃষ্টি করে। দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় প্রকল্পের সূত্রে - হিন্দু মুসলমান নেতৃবর্গ - সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে -- বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে অমুসলমান দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে বাধ্য। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে এ আশংকা নেই। ভারতীয় জাতীয়ত্বে সামিল হলে এই শংকা একদিন সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে।

১২ ।। ভোটের ক্ষেত্রে বিচিত্র সব কাণ্ড হয়। এরসাদ সাহেবের আমলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু ভোট আদায়ের জন্য, শোনা গেছে প্রথমে দাঙ্গা বাঁধিয়ে, মন্দিরাদি ভাঙার ব্যবস্থা করে, পরে শান্তি পাওয়ার ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার, মন্দিরাদি বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন তিনি। এটা পরিচিত কৌশল। সাধারণ মানুষ কী হিন্দু কী মুসলমান - দাঙ্গা অশান্তিও চায় না, তাদের টেনে আনা হয়, আতঙ্ক সৃষ্টি করে, গুন্ডা প্রভৃতি দিয়ে হাঙ্গামা বাঁধিয়ে এবং তা অধিকাংশক্ষেত্রেই রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনের জন্য। রাজনীতির বাহিরে এই ঐক্য,

সম্প্রীতির সংগঠনও করতে হবে। তার প্রয়াসও আছে আমাদের দেশে-ও।

৬

১৩॥ মানুষ যে মানুষ হিসাবে দেখা - ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে আন্তরিক মিলনের পরিচয় আছে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে। কর্তাভজা ও সম্প্রদায়, বাউল প্রমুখ সমাজে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পারিবারিক বা সামাজিক বিভেদ নেই - "মানুষ সত্য" - এই যৌথ ধর্মাচারের মধ্যে জীবনের প্রতিষ্ঠা রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাটস্কি ও আমেরিকার অলকট ১৮৭৫-এ আমেরিকার নিউইয়র্কে - Theosephical society প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৯ বোম্বাইতে এবং ১৮৮০ কলিকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। অডিয়ারে এখন সোসাইটির প্রধান কেন্দ্র। মাদাম পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল সত্য নিয়ে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব আন্দোলন সৃষ্টি করেন। প্রতিটি অধিবেশনে, সবধর্মের মন্ত্র পাঠ হয়। অডিয়ারে হিন্দু , বৌদ্ধ, ইসলাম, খৃষ্টান, শিখ সব ধর্মের ধর্মমন্দির আছে।

১৪॥ কোন রাজনৈতিক প্রোগ্রাম ও প্রচারে ঐক্যবোধ ও সম্প্রীতি যথার্থভাবে হবে না। ধর্মকে আশ্রয় করেই মানবধর্মের মিলনধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একটা মহাশক্তি আছে বিশ্ব প্রদীপের মধ্যে। শক্তিটি সচেতন ও করুণাময় এর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা। জন্ম সংস্কার জল মানুষের মধ্যে। কাজেই ধর্মের মধ্যে এই মনোভাব বিদ্যমান। নাস্তিকতার পথে - মন্দির-মসজিদ-গির্জা সব বয়কট করে শ্রেণীহীনতার - একমানব ধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস করেছিল সোভিয়েট রাশিয়া - তা ব্যর্থ হয়েছে। হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে না পারলে

যথার্থ স্বাধীনতা না পেলে ঐক্য সম্ভব নয়। কাজেই মানুষের ধর্মবোধের মধ্যে - মনুষ্য মর্যাদার মধ্যে ঐক্য স্থাপন প্রয়োজন। ধর্মাচার্যরা সবধর্মের মূলতত্ত্ব আহরণ করে। স্বামী বিবেকানন্দর উক্তি - "বাগাড়ম্বর নয়, তত্ত্বালোচনা নয়, যুক্তি তর্ক নয়। চাই অনুভূতি, সেই অনুভূতি হইলেই আমি বলি বাস্তবজীবনে পরিণত ধর্ম।"

১৫ ॥ সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা কখন একা ভারতের দ্বারা সম্ভব নয় · অখন্ডভারতের দায়িত্ব। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ইসলামী ধর্মীও রাষ্ট্র থাকলে - ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পূর্ণ বিনাশ সম্ভব নয়। শিক্ষা সহযোগিতা প্রমুখ দ্বারা, - বাস্তব জীবন সমস্যার অনুভবে যদি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ধারার বিকাশ হয়। নতুন প্রজন্ম নিজ নিজ ধর্মের যথার্থ স্বরূপ অনুভব করে - তবেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর যেটি সম্ভব হলে বা সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আবার আমরা পাক্-ভারত বাংলাদেশ এই তিন বিচ্ছিন্ন অঙ্গের কনফেডারেশনের মাধ্যমে সংযুক্ত করে। মহাভারত রচনার স্বপ্ন দেখতে পারি না কী?

সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

পূর্ণেন্দু ভৌমিক

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে দীর্ণ, সারা দেশ — বিপন্ন জাতীয় সংহতি। এই সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের মুহূর্তে। পরে ধর্মনিরপেক্ষতার আপাত মহৎ তত্ত্বগত ভাবনা বাগাড়ম্বরের মধ্যে যে পরিমাণ বিঘোষিত, দলীয় স্বার্থের তাগিদে বারেবারে তা লঙ্ঘিত। ফলে, মৌলবাদী শক্তিগুলি পুষ্ট হয়েছে ; সৃষ্টি করেছে এই ভয়াবহ সংকট। সেদিনের সেই বীজ আজ মহীরুহ, বিষবৃক্ষ — গভীরে সঞ্চালিত তার শিকড়। খণ্ডিত ভারতকে বহুধা খণ্ডিত করবার উদ্যোগ পর্বের মর্মন্তুদ সূচনা।

বস্তুত আধুনিক সাম্প্রদায়িকতাবাদের উদ্ভব উনিশ শতকে। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তোর অন্যতম ফলশ্রুতি : ।। এক ।। খনেদী জমিদারশ্রেণীর উৎখাত ; ।। দুই ।। নগর কলকাতার হঠাৎ-ধনীর জমিদারী লাভ ; ।। তিন ।। নবোদ্ভূত চরম বিলাসী এই জমিদারদের অর্থলোভে নির্মম প্রজাপীড়ন ; এবং ।। চার ।। ইংরেজ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে জমির সত্ত্ব ছিল প্রজাদের, তা বর্তালো জমিদারের ওপর। বঞ্চিত ও নিপীড়িত প্রজাদের সঙ্গে স্বভাবতই জমিদারদের সম্পর্ক দাঁড়ালো বিরোধের। কৃষকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, জমিদারদের মধ্যে গরিষ্ঠ সংখ্যক হিন্দু। জমিদাররা ইংরেজদের কৃপাপুষ্ট, রায়ত

ইংরেজ-বিরোধী। তার সঙ্গে যুক্ত হল নীলকরদের অত্যাচার। ১৮৩১ সালে নবসৃষ্ট এই জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হল বারাসতের তিতু মিঞার নেতৃত্বে। হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকদের এই সংগ্রামী ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্যে দাড়ির ওপর কর বসালেন পূর্ণার জমিদার কৃষ্ণ রায়। তিতু মিঞাসহ সব মুসলমান প্রজাদেরই দাড়ি ছিল, হিন্দুদের ছিল না, — তাই তাদের কর থেকে রেহাই। সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্রোহের ইতি ঘটানো হল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা যেমন নগণ্য, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের গভীর অনীহাও তেমনি লক্ষণীয়। সংস্কার আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যেই সীমিত ছিল।

উনিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে সৈয়দ আহমেদ খানের ধর্ম-সংস্কৃতি ও শিক্ষা-আন্দোলনে প্রাথমিকভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিফলন না ঘটলেও গোঁড়া উলেমা, জমিদার ও উপনিবেশিক কর্তাব্যক্তিদের চাপ মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটালো। বন্ধ হয়ে গেল তাঁর সংস্কার কর্মের মুখপত্র 'তাহাজিব-উল-আখলাক'। তিনি বাধ্য হলেন আলিগড় কলেজে পরম্পরাগতভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ শতকের পরের দশকের সূচনাকাল অবাধি অধিকাংশ মুসলমান বুদ্ধিজীবিরা লালিত হয়েছেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির মধ্যে। তাই মানসিক মুক্তি বা মননের ব্যাপকতা ব্যাহত হয়েছে। এইসব শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ভাবনার আনুগত্য প্রবল হয়ে ওঠে। এই জন্যে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের দায়ভার অনস্বীকার্য।

রামমোহনের অপৌত্তলিক ভাবনা এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত ; ব্যক্তিগত জ্ঞান ও যুক্তিগ্রাহ্য শাস্ত্রের সমন্বয়ে অনুভূত। তাঁর অপৌত্তলিক বিশ্বাসজাত সমন্বয়বাদ শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে আদর্শ হিন্দুত্বের আবেগে অভিভূত। তাই ১৮৬৭ সালে 'চৈত্রমেলা' 'হিন্দুমেলা' হিসাবে স্বীকৃত। জাতীয় ভাবনার সঙ্গে হিন্দুত্বের প্রচারের প্রাবল্য। এই মেলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষণা — বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। আবার কেশবচন্দ্র সেনের বিচ্যুতি রামমোহনের সমন্বয় ভাবনার প্রসার ক্ষুণ্ণ করল।

অন্যদিকে ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল নব্যহিন্দুত্ব। রক্ষণশীল 'ধর্মসভা'র প্রভাব এক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা যায় না। আবির্ভাব ঘটল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুজাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিয়েছেন কোনো কোনো ঐতিহাসিক। তাঁদের মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অংশ বিশেষের 'উৎকট স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে' ব্যবহার সাহায্য করেছে সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করতে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের বিগ্রহ-কল্পনা একান্তভাবে হিন্দুভাবনারই নামান্তর। এই উপন্যাসে 'ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রোরোচনা রীতিমতো উচ্চকিত। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ইসলাম-বিরোধ তাঁর মনোগত না হলেও তার থেকে উদ্ভূত পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না। আবার অন্য ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশ্লেষণ করে তাঁর ধর্মীয় সহনশীলতাকেই উপজীব্য করেছেন ; তাঁর রচনার বিকৃত প্রয়োগ থেকে যে সাম্প্রদায়িকতার পরোক্ষ প্রকাশ তার জন্যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে পরোক্ষে দায়ী করতে চান নি। তবু, মানতেই হয়, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২-তে মর্মন্তুদ অযোধ্যা-কাণ্ডের পর লোকসভার অধিবেশন 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত দিয়ে শুরু হতে পারে নি প্রবল বাধার জন্যেই। অর্থাৎ,

সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হিসাবে সঙ্গীতটি গৃহীত হয় নি অতীতে এবং বর্তমানেও।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদের তিনটি ধারা : (এক) বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ধারা, (দুই) শশধর তর্কচূড়ামনি-কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন - অক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রবর্তিত ধারা, (তিন) বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত ধারা। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত ধারা অনুশীলন সাপেক্ষ ও মানবতাবাদী। দ্বিতীয় ধারাটি সমকালীন প্রগতিশীল হিন্দুভাবনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ধর্মীয় সমন্বয়বাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের কথাও বলেছেন, যা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ নির্ভর নয়, ভাববাদী চিন্তাপ্রসূত। সাম্প্রদায়িক বিভেদ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি : 'মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। দারিদ্র্য ও অবহেলার জন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয় নাই কেবল তরবারি ও অগ্নির বলে ইহা সাধিত হইয়াছিল — একথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি।' ইসলামের সাম্যনীতি যেমন স্বীকৃতি লাভ করল, তেমনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও একান্তই কাম্য হয়ে উঠল তাঁর উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মধ্যে। তবে বিবেকানন্দের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক ভাবাশ্রিত দেশপ্রেম পক্ষান্তরে হিন্দুজাতীয়তাবাদের নামান্তর হয়ে ওঠে কালক্রমে।

এই তিনটি ধারার সঙ্গে পরোক্ষভাবে হলেও আর একটি ধারার সংযোজন অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুত্ববোধের প্রগাঢ়তা পুনরুত্থানবাদীদের ধ্যানধারণার মতোই রক্ষণশীল হয়ে উঠল রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' উপস্থাপন ও 'মহা হিন্দু সমিতি' স্থাপনের প্রয়াসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। 'জাতিভেদ' প্রসঙ্গে সনাতন হিন্দুদের মতোই তিনি লিখলেন, 'জাতিভেদ প্রথা কেবল ধর্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্বক লোকসমাজের উপকার সাধন করে এমত নহে ;

দেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া আর এক প্রকারেও লোক সমাজের উপকার সাধন করে।'

এরই প্রভাবে বর্তমান শতকের প্রারম্ভেই (১৩০৮ সালে) নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকালে হিন্দুজাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ। আবার অন্যদিকে, ১৮৭৬ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন – জাতীয়তাবাদী ও রাষ্ট্রনৈতিক কর্মধারা ছাড়াও যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, 'to promote friendly feelings between Hindus and Muslims.' এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পন' নাটক। হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বিষয়টি তিনি যেমন ব্যক্ত করলেন, তেমনি ঘোষণা করলেন – মূল বিরোধ ধর্মীয় নয়, অর্থনৈতিক - বিত্তবান ও বিত্তহীনদের বিরোধ। তিনি লিখলেন : 'এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান, পরস্পর এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক, সংসার কার্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না।' বস্তুত উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও মশারফ হোসেন সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে অর্থনৈতিক কারণ উল্লেখ করলেন তা অভূতপূর্ব এবং একান্তভাবে তা গভীর সামাজিক অনুভূতিরই ফসল ; এবং বর্তমান বিশ্লেষণেও এই সত্যটিই প্রকট।

উনিশ শতকের শেষ পাদে এবং বর্তমান শতকের প্রারম্ভিক। পর্যায়ে জাতীয় নেতাদের মধ্যে অনেকেই, যেমন বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, অরবিন্দ ঘোষ তাঁদের কার্মে, বক্তৃতায় ও রচনায় হিন্দুত্বকে প্রকট করে তুলেছেন। জাতীয়তাবাদকে ধর্ম আর সেই ধর্ম সনাতন হিন্দুধর্ম (Collected works, VOL II, p-10) বলে যখন অরবিন্দ ঘোষ দৃঢ় মত প্রকাশ করেন, বা

জাতীয়তাবাদের প্রেরণা হিসাবে হিন্দুদের প্রাচীন বেদান্তবাদকে স্বীকৃতি জানান বিপিনচন্দ্র পাল (Continuity and Change in Indian Politics, K.P. Karunakaran, P-97-98) – তখন সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রকাশ্য উদ্ভব কতটা প্রবলভাবে সূচিত হয়েছিল - বুঝতে অসুবিধা হয় না। সশস্ত্র আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরাও হিন্দুত্ববোধে প্রাণিত ছিলেন বিশেষভাবে।

প্রাচীন হিন্দু-আদর্শে ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত রবীন্দ্রনাথও 'বঙ্গদর্শন'-এ য়ুরোপীয় ন্যাশনালাইজম্ ও প্রাচ্য জাতীয়তাবোধের আদর্শগত দ্বন্দ্বের বিষয়গুলি পরিস্ফুট করে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সমাজকেন্দ্রিক জীবনবোধকেই বরণীয় করে তুললেন। য়ুরোপীয় সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি-সর্বস্বতা ধর্মের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে স্পর্ধাভরে, অথচ ভারতীয় জীবনধর্মে 'রিপুর বন্ধনকে' ছেদ করার প্রয়াসেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। তিনি লিখলেন, 'প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার মূলে এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছিল। সেইজন্য রাষ্ট্রীয় মহত্ত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার অধঃপতন হইয়াছে। হিন্দু সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেইজন্য আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশা ত্যাগ করিবার নহে।' আর এই পর্বেই বর্ণাশ্রমের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভাবনাও তাঁর মধ্যে একান্তভাবে প্রকাশিত। এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কায়স্থ অধ্যাপক কুঞ্জলাল ঘোষকে ছাত্রদের পদধূলি নিয়ে প্রণাম করা বিধেয় কিনা – এই নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজ-বিরোধী তাহাকে এই বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না ; সংহিতার যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে

নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।' এমন কি খাওয়ার সময় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদ মেনে খেতে বসতে হত। প্রায় দশ বছর পরে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় রবীন্দ্রনাথই লিখছেন, 'মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতার লক্ষণই ফুটিয়াছে। ....বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ১৯০৫-৬ সাল থেকে ধীরে ধীরে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে উঠতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ও পরবর্তী রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একদিকে ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক শোষণ ও পীড়ন অন্যদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাম্প্রদায়িক ও বর্ণগত ভেদবুদ্ধির প্রবর্তনা ; রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ এক মহত্তর চেতনার উন্মেষ ঘটে এই পর্যায় থেকেই। এখানে তাঁর হিন্দুত্ব থেকে ধর্মনিরপেক্ষতায়, স্বদেশবোধ থেকে বিশ্ববোধে উত্তরণের প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভবের তিনটি স্বরূপ : এক ।। শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংযত করা, সামঞ্জস্য সুসংবদ্ধ করা ; দুই ।। শক্তি সংযম-শাসিত হলেই কল্যাণকর্মের যথার্থ প্রেরণা ; তিন ।। আর এই কল্যাণকর্ম অহং-মুক্ত হয়ে প্রেমের অনুভূতিতে একাত্ম হয়ে সকলের মধ্যে বিস্তৃত হয়।

তাই 'আমাদের দুর্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গল সোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়। স্বাতন্ত্র্য যদি মঙ্গল-অনুসারী না হয় তবে তা বিকৃত। স্বাতন্ত্র্য যেমন সত্য তেমনি সকলের সঙ্গে মিলও। তাই হিন্দুত্বের সংকীর্ণতায় গোরার যে উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ তা অহং-মুক্ত হয়ে যায় আনন্দময়ীর মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষ ভারতবর্ষের স্বরূপ উপলব্ধিতে। এখানে স্মর্তব্য, গোরার চরঘোষপুরের অভিজ্ঞতা।

মুসলমান-প্রধান গ্রামে একমাত্র হিন্দু, একঘর নাপিত। কিন্তু বৃদ্ধ নাপিত ও তার স্ত্রী একটি মুসলমান ছেলেকে লালনপালন করছে। গোরার আহত হিন্দুত্ব নাপিতকে ভর্ৎসনা করতেই সে বলল, 'ঠাকুর আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাৎ নেই।' এ যেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগীয় সন্ত-প্রভাবজাত অনুভব ; এ যেন সাধু রজ্জবের প্রার্থনারই বাস্তব রূপ চরঘোষপুরের নাপিতের ঘরে। রজ্জব বলেছেন - 'হাথ জড় গুরু সূঁ হেঁট মিলৈ হিন্দু মুসলমান'। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যে হাত জোড় করে তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা গুরুর কাছে।

পূর্বেই বলেছি, জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ-কাল থেকেই হিন্দুত্বের প্রবল প্রাধান্যের কথা। বিপিনচন্দ্র পাল ও হেমচন্দ্র মল্লিক রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে এমন একটি গান রচনার অনুরোধ করলেন যাতে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশে যাবে ; উদ্দেশ্য - দুর্গাপূজাকে দেশে নতুনভাবে উদ্দীপনার সঙ্গে প্রবর্তিত করা। রবীন্দ্রনাথ তা লিখতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন — 'অয়ি ভুবন-মনমোহিনী' গানটি। এই গানটি প্রসঙ্গে তিনি পরে জানান, 'এ গান সর্বজনীন ভারত রাষ্ট্রসভায় গাবার উপযুক্ত নয় কেননা এ কবিতাটি একান্তভাবে হিন্দু সংস্কৃতি আশ্রয় করে রচিত। অহিন্দুর এটা সুপরিচিত ভাবে মর্মঙ্গম হবে না।'

এই সচেতনতাই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদের ঊর্ধে তুলেছিল ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই। তাঁর ধর্মভাবনার রূপান্তরের ধারা লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হবে, ধর্মানুভূতি বিকাশ লাভ করে তাঁর জ্ঞান এবং রাষ্ট্রিয় ও আন্তর্জাতিক নানা অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে — যা তাঁর কালের সমস্ত মানবতাবাদীদের থেকেই স্বতন্ত্র। এই জন্যেই তিনি শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সদস্য পদও ত্যাগ করেন। এই বোধ থেকে জন্ম তাঁর 'মানুষের ধর্ম'। তাই আইনস্টাইনকে তিনি বলেন (১৯৩০-এ), — এ বিশ্ব মানবিক। 'This

world is a human world', কারণ, 'truth, which is one with the universal Being, must essentially be human....' দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে তিনি লিখছেন : 'আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে'।

স্বভাবতই হিন্দু স্বাদেশিকদের আচার-ব্যবহার রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করেছে বারবার। হিন্দু স্বদেশী-প্রচারকের জল খাবার জন্যে সহযোগী মুসলমানকে দাওয়া থেকে নেমে যেতে হয়েছে। '....সমাজের (এই) অপমানটা গায়ে লাগে না হৃদয়ে লাগে।' আরো বললেন তিনি, 'বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যাপারটা আমাদের অন্নবস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যত দূর পর্যন্ত অখণ্ড তত দূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনো দিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।'

১৯৩১ সালের ২৯ মার্চ করাচী কংগ্রেসের কয়েকদিন আগে, ২৩ থেকে ২৫ মার্চ, কানপুরে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। কানপুরের দাঙ্গায় বিব্রত গান্ধীজি ঘোষণা করেছিলেন, মুসলমানরা নূতন সংবিধানে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে বা নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতির ওপর যুক্তভাবে কোনো দাবি রাখলে তা তিনি মেনে নেবেন। ফলে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানরা প্রশ্রয় পেলেন। জিন্নার চৌদ্দ-দফা দাবি গৃহীত হল মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনে। জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের সম্মেলনে যৌথ-নির্বাচনব্যবস্থার প্রস্তাব গৃহীত হল। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রাবল্যে এবং দাঙ্গায় বিচলিত রবীন্দ্রনাথ। তিনি জাতীয় নেতাদের সমাধান-সূত্রের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। আগেও তিনি বলেছেন – উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি পারস্পরিক সামাজিক মর্যাদার

ভিত্তিতেই সম্ভব। এবারও জোড়া-তালি দেওয়ার ব্যাপারটা কাম্য ছিল না তাঁর কাছে। সম্প্রদায়গতভাবে পরস্পরের মধ্যে যে বিভেদ ও বিরোধ তার সমাধান না করে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে আপোষ-মীমাংসা কোনো স্থায়ী সমাধান আনতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের উদাহরণ তুলে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, এই বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কারের বিলোপ ঘটানো এবং রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মের প্রাধান্যকে লুপ্ত করা। রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের জন্যে ধর্মীয় সংস্কার ও শিক্ষার ব্যাপক সংস্কারের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করলেন। গোল-টেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেদিনের মন্তব্য আজো নির্মমভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি বললেন, 'কথা হয়েছে, ভারতবর্ষে এক রাষ্ট্রশাসন না হয়ে যুক্তরাষ্ট্র শাসননীতির প্রবর্তন চাই। ....কিন্তু তবু একটা কঠিন গ্রন্থি রয়ে গেল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও বিরোধ। এই বিচ্ছেদটা নানা কারণে আন্তরিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রলেপ দিয়ে এই ফাটল নিবারণ করা চলবে না ; কোনো কারণে তাপ বেড়ে উঠলেই আবার ফাটল ধরবে।' তার স্পষ্ট বক্তব্য, নিজেদের মধ্যে সত্যকার বিভেদ থেকেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতার 'হিস্যার' দাবি করা হয়। তখন অখণ্ড স্বার্থের কথাটা একেবারেই গৌণ হয়ে পড়ে। তাই রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ; রাষ্ট্রিক বিষয় বুদ্ধির যোগে গোল-টেবিল পেরিয়েও এই গোল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে এমন আশা আছে কি ?'

এটা আজ ঐতিহাসিক সত্য, দেশ-ভাগ হয়েছে এই হিস্যার তাগিদে। গৌণ হয়ে গেছে উভয় সম্প্রদায়ের অখণ্ড স্বার্থ। আর আজো রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যার তাড়নাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হচ্ছে। ধর্মকে রাষ্ট্রতন্ত্র থেকে দূরে রাখার চেষ্টাও তাই এই কারণেই উপেক্ষিত থাকছে।

বাস্তব অবস্থাটা যথার্থ প্রতিকূল বলেই রবীন্দ্রনাথ যা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি, তা ইঙ্গিতেই বুঝে নেওয়া যায়। সাম্প্রদায়িক মিলটা শুধু মুখের কথা নয়, পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের মধ্যেই তার বাস্তব অবস্থান। পূর্বে আলোচিত 'হিন্দু-মুসলমান' (১৯৩১) প্রবন্ধের প্রায় আট বছর আগে লেখা একটি প্রবন্ধে সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি লিখলেন, 'সুইজারল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক, ভেদবুদ্ধিটো নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর করবার প্রস্তাব হল মাত্র হিন্দু সমাজপতি উদ্বেগে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে হরতাল করবার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যারা নিজেদের এক মহাজাত বলে কল্পনা করেন তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তবে তাদের মিলন কখনোই প্রাণের মিলন হবে না ; সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পারবে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়।' নাড়ীর যোগে যুক্ত হওয়ার তাৎপর্য রক্তবিমিশ্রণের মধ্যে নিহিত। বস্তুত এহেন সমাধান সুদূর পরাহত, সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসও আন্তরিক নয়।

এটা আজ বহু কথিত, হিন্দু মুসলমানের বিভেদের জন্যে দায়ী 'বিদেশী তৃতীয় পক্ষ', 'অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ তারই'। রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করে নেন নি। তাঁর বক্তব্য, তলা ফাটা জাহাজটা যদি ঝড়ে ডুবে যায়, তার জন্যে দায়ী ঝড় নয়, জাহাজটা। বহুদিন ধরে ধর্মীয় কুসংস্কার ও মূঢ় আচারের আঘাতে আঘাতে যে ফাটল তৈরি হয়েছিল, ইংরেজদের কূটচালে তা ডুবতে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ এক সমাধান হিসাবে গণশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। এই শিক্ষাই আনবে সচেতনা, যুক্তির দ্বারা গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষমতা। আবার এর দ্বারাই সম্ভব হবে গণসংযোগ — যার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। কুসংস্কার থেকে মুক্তি ঘটবে।

আর্থ-সামাজিক কায়েমী স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতাবাদের সূত্রপাত ভবে প্রয়োজন মতো। ১৯৩৬ সালের পর জিন্না ও সাভারকার ঘোষণা করলেন, হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। মধ্যযুগীয় অন্ধ ধর্মীয় চিন্তা ও আচারকে উস্কে দেওয়া হয় জাতিগত স্বার্থে নয়, শ্রেণী স্বার্থে। 'পোকাকাটা জিনিষের' কেনা-বেচা যারা করে উভয় সম্প্রদায়ের সেই সাধারণ দরিদ্র মানুষগুলি শিকার হয় দাঙ্গার আর কায়েমী স্বার্থ তার আখের গুছিয়ে নেয়। ইংরেজ যেমন তার সাম্রাজ্যবাদী-স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করেছে ; তেমনি করেছে ও করে চলেছে স্বাধীনতা-উত্তর কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীও। তাই আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা আরো স্বাধীন চিন্তার সুযোগ বা অবকাশ করে দেয় না — পুঁথি মুখস্ত ও পাশ করার মধ্যেই তার সাফল্যের বিচার। বিজ্ঞান যুক্তিবাদী মননের ভিত কদাচ দৃঢ় করে, ডিগ্রীটাই তার লক্ষ্য-স্থল। ফলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার মুক্তি ঘটল না আজো শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই। সেইজন্যেই মৌলবাদী শক্তির পেশীর এই নারকীয় আস্ফালন। কায়েমী স্বার্থের জন্যেই ভারতীয় লোকসাধারণ আজো নিরক্ষর। দাঙ্গার শিকার।

স্মরণ করছি, রবীন্দ্রনাথের সেই প্রজ্ঞাসিদ্ধ সতর্কবাণী : ধরে নেওয়া গেল গোল-টেবিল বৈঠকের পরে দেশের শাসনভার আমরাই পাব। কিন্তু, দেশটাকে হাত ফেরাফেরি করবার মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ সন্ধিক্ষণ আছে। সিভিল সার্ভিসেসের মেয়াদ কিছুকাল টিকে থাকতে বাধ্য। কিন্তু, সেইদিনকার সিভিল সার্ভিস হবে ঘা খাওয়া নেকড়ে বাঘের

মতো। মন তার গরম হয়ে থাকবার কথা। সেই সময়টুকুর মধ্যে দেশের লোক এবং বিদেশের সেবকের কাছে কথাটা দেগে দেগে দেওয়া তার পক্ষে দরকার হবে যে, ব্রিটিশরাজের পাহারা আলগা হবা-মাত্রই অরাজকতার কালসাপ নানা গর্ত থেকে বেরিয়ে চারি দিকেই ফণা তুলে আছে, তাই আমরা স্বদেশের দায়িত্বভার নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমাদের আপন লোকদেরকে দিয়েও একথা কবুল করিয়ে নেবার ইচ্ছা তার স্বভাবতই হবে যে, আগেকার আমলে অবস্থা ছিল ভালো। সেই যুগান্তরের সময়ে যে যে গুহায় আমাদের আত্মীয়-বিদ্বেষের মারগুলো লুকিয়ে আছে সেই সেই খানে খুব করেই খোঁচা খাবে। সেইটি আমাদের বিষম পরীক্ষার সময়। সে পরীক্ষা সমস্ত পৃথিবীর কাছে। এখন থেকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকতে হবে যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টির সামনে মূঢ়তায় বর্বরতায় আমাদের নূতন ইতিহাসের মুখে কালী না পড়ে।'

সেদিনের (১৯৩১) সেই সতর্কবাণী আজ নির্মম সত্যে পরিণত। অনৈতিহাসিক ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার 'মূঢ়তায় ও বর্বতায়' বিশ্বজগতের সামনে আজ ভারতের মুখ কালিমালিপ্ত। এই সর্বনাশ থেকে মুক্তির পথ নিছক বাগাড়ম্বরে মিলবে না। সংস্কারমুক্ত সচেতন গণশিক্ষা ও গণসংযোগের জন্যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার যথার্থ বিজ্ঞান নির্ভর সংস্কার করতে হবে। আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের বাধা হবে পর্বত প্রমাণ ; কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা অতিক্রম করতে পারলেই সম্প্রদায় নির্বিশেষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, যা ছিল রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাম্য, বাস্তবায়িত হতে পারবে নিশ্চয়ই। নচেৎ মৌলবাদী শক্তির তাণ্ডবে আরো খণ্ডিত হবে ভারত। তাই -

'চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।'

॥ সহায়ক গ্রন্থ : সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র - বিনয় ঘোষ ; বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা - বিনয় ঘোষ ; ভারতবর্ষ ও ইসলাম - সুরজিৎ দাশগুপ্ত ; আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ - বিপান চন্দ্র ; স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস - অমলেশ ত্রিপাঠী ; স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা - উদ্বোধন কার্যালয় ; রবীন্দ্রজীবনী - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ - নেপাল মজুমদার ; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস - নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; রবীন্দ্ররচনাবলী ; উনিশ শতকের বাংলা : ব্রাহ্মসমাজভাবনা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ - পূর্ণেন্দু ভৌমিক - তত্ত্ব - কৌমুদী (১১৪ বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা, ভাদ্র ১, ১৬ ১৩৯৯) ॥